সুমন্ত আসলাম

বাউন্ডুলে

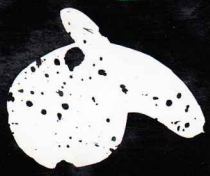

১

সুমন্ত আসলাম

বাঘ মুখো

৯

পার্ল পাবলিকেশন্স

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার। ছোট্ট একটা লাইব্রেরি করেছি সাগুফতা হাউজিংয়ের একটা জায়গায় ছুটির দিন সকালে চলে যাই আমি সেখানে, কাটিয়ে দিই সারাটা দিন—বই পড়ি, লিখি, নাম না জানা হরেকরকম পাখি দেখি, কিছু একটা খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প করি প্রতিবেশী কাকদের সঙ্গে, কোনো কোনোদিন একপাওয়ালা কোনো শালিকের সঙ্গে।

শুক্রবার ছিল সেদিন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯। লাইব্রেরিতে বসে আছি, ধূসর একটা পাখি দেখছি। হঠাৎ একটা ফোন, সমস্ত পাঁজর ভেঙে দেওয়া ফোন। নদীতে গোসল করতে গিয়ে আমার বড় বোনের একমাত্র ছেলে আর মেঝ বোনের বড় ছেলে—দুজন, একসঙ্গে পানিতে ডুবে মারা গেছে। একই বয়সী ছিল ওরা, চব্বিশ বছরের যুবক ছিল দুজন।

প্রিয় মাহমুদ
প্রিয় নাজমুল

বাবা রে, তোরা তো জানিস—আমি যতটা রাগী মানুষ, আবেগীও ঠিক ততটা। অল্পতেই রেগে যাই, নিশ্চুপ হয়ে যাই আবার অল্পতেই। তোরা আমাকে ক্ষমা করে দিস, বাবা। একা থাকলেই, চুপচাপ কিছু একটা ভাবতে নিলেই, তোরা দুজন এসে আমার পেছনে দাঁড়াস, স্পষ্ট টের পাই আমি সেটা, ঘ্রাণ পাই তোদের পবিত্রতার। স্রষ্টার কাছে আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি—পরজনমে স্রষ্টা যেন আমাকে তোদের মতো বানায়, তোদের মতো শুদ্ধ যুবক হওয়ার আকুতি জানাই আমি তার কাছে!

কথাটা কে বলেছিলেন মনে নেই—মানুষকে মেরে ফেলা যায় কিন্তু ধ্বংস করা যায় না। না, আমরা মরেও যাইনি, ধ্বংস হয়েও যাইনি। আমরা বেঁচে আছি মানুষের মতোই, শুদ্ধতায়, মানবিকতায়, মনুষ্যত্বে।

আমরা এরকম বহু বছর বেঁচে থাকতে চাই, নষ্ট মানুষদের ভীড়েই, নষ্টদের নষ্টামির মাঝেই। আমরা বরং সেইসব মানুষদের করুণা করি, যারা ঈর্ষাকাতর ছারপোকা হয়ে জীবন কাটায়, রাতের পেঁচার মতো ওঁৎ পেতে থাকেকারো ক্ষতি করার জন্য, যাদের মননে-চিন্তায় কেবল অন্যের অমঙ্গল কামনা। তারাও বেঁচে থাক—শুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত!

সুমন্ত আসলাম
সাগুফতা হাউজিং, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

ক্ষমতা গ্রহণের তিন দিন পর ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠলেন বারাক হোসেন ওবামা। বেডরুমের বুলেটপ্রুফ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন হোয়াইট হাউজের সামনে প্রায় কয়েকশ' ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তাঁর এই নতুন আবাসস্থলের দিকে। কিন্তু অবাক করা বিষয়টা হচ্ছে—সবগুলো ছেলেমেয়ের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা, তাদের কোনো চেহারা দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না তারা কে এবং কোথা থেকে এসেছে।

কপালে ভাঁজ পড়ে গেল ওবামার। এত সকালে এত ছেলে মেয়ে কেন এখানে? দ্রুত সকালের প্রাথমিক কাজ সেরে তিনি অফিস রুমে এলেন। সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করতেই সেক্রেটারি বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলো আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছে।'

'কেন?'

'তা বলেনি।'

'তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'জি।'

'কিছু বলেনি ওরা?'

'না। শুধু বলেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় ওরা।'

'কিন্তু ওদের চেহারা ওরকম কাপড় দিয়ে ঢাকা কেন?'

সেক্রেটারি একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ও বিষয়েও জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু ওরা এ বিষয়েও কিছু বলেনি।'

'ওরা কেন এরকম ভাবে দেখা করতে এসেছে—আমার মাথায় তো কিছু আসছে না, তুমি কিছু ভেবেছ?'

'না, স্যার। আমার মাথায়ও কিছু আসছে না।'

'ঠিক আছে, এসে যখন পড়েছে, ডাকো। আমাদের বড় হলরুমটাতে গিয়ে বসাও।' বারাক ওবামা কিছু শঙ্কিত গলায় বললেন।

বারাক ওবামা, স্যরি অভিনন্দন জানাতে পারছি না আপনাকে

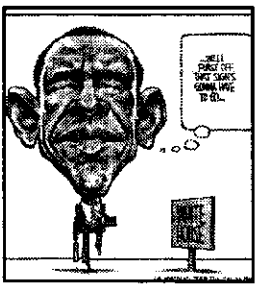

২

হলরুমের সামনের বেঞ্চে বসা মেয়েটা বারাক ওবামাকে বলল, 'আঙ্কেল, একজন বাবা হিসেবে আপনার দু' মেয়ে মালিয়া আর সাশা আপনার কাছে কতটুকু প্রিয়?'

'অনেক। প্রাণের চেয়ে প্রিয়।'

'সেই মালিয়া আর সাশার যদি কিছু হয়, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?'

'বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যাবে।'

মেয়েটা একটু চুপ থেকে বলল, 'আপনি কি জানেন, কয়েকদিন আগে এরকম অর্থহীন হয়ে গেছে অনেক বাবা-মায়ের জীবন?'

'বুঝলাম না।'

'কয়েকদিন আগে ভারতের শুধু একটা হোটেল বোমা বিস্ফোরণে আপনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু সমস্ত গাজাতে এই যে এত বড় বড় বোমা ফেলা হলো, আপনি তাতে কিছুই বললেন না। সেখানে আমাদের মতো কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মারা গেছে, তাদের বাবা-মায়ের বুক শূন্য হয়ে গেছে। অথচ আপনি পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন! মেয়েটি আবার একটু চুপ থেকে বলে, 'আচ্ছা আঙ্কেল, যদি গাজায় আপনার মেয়ে দুটো থাকত আপনি তাহলে কী করতেন?'

বারাক ওবামা কিছু বললেন না। মাথাটা নিচু করে ফেললেন। একটু পর মাথাটা উঁচু করতেই চিৎকার করে ওঠেন তিনি। সবগুলো ছেলেমেয়ে মাথার কাপড়টা সরিয়ে ফেলেছে। কোনো ছেলেমেয়েরই চোখ নেই, কান নেই, নাক নেই। কারো কারো মাথাও নেই।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আঙ্কেল ভয় পাবেন না, আমরা গাজা থেকে এসেছি। ক'দিন আগেও আমরা আমাদের নাক দিয়ে ফুলের সুবাস নিতাম, কান দিয়ে নদীর কুল কুল শব্দ শুনতাম, চোখ দিয়ে নীল আকাশ দেখতাম। কিন্তু হায়...!' মেয়েটি গলাটা করুণ করে বলে, 'আচ্ছা আঙ্কেল, আমাদের দোষটা কী ছিল, বলুন তো!'

বারাক ওবামা এবারও কোনো কথা বললেন না। মাথাটা নিচু করে ফেলেন আগের মতোই।

সুফিয়া খাতুনের তিন বছরের সংসার ভেঙে যায় মাত্র একটি সাইকেলের জন্য। বিয়ের সময় বরকে একটা সাইকেল দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিন বছর কেটে গেলেও সুফিয়া খাতুনের অভাবী পিতা তার কথা রাখতে পারেননি। ফলে সুফিয়া খাতুনকে তালাক দিয়ে দেয় তার স্বামী। তিন বছরের মায়ার সংসার ছেড়ে সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে বাপের বাড়ি। অথচ একটা সাইকেলের দাম মাত্র পাঁচ হাজার টাকা!

১ কোটি টাকায় এরকম ২০০০টি সাইকেল পাওয়া যাবে। সুফিয়ার মতো ২০০০ জন মেয়ের সংসার বাঁচানো এই টাকা দিয়ে!

ফিসের অভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেনি সিরাজগঞ্জ জেলার হাঁটিকুমরুল স্কুলের মিজান খন্দকার। একবার না, তিনবার দিতে পারেনি। তার বাবা নেই, মা এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে সংসার চালান। অভাবের সংসারে নুন আনতেই যেখানে পান্তা ফুরায় সেখানে পরীক্ষার ফিস ১৬০০ টাকা যোগাড় করবে কীভাবে নিত্য অভাবী মা?

১ কোটি টাকায় এরকম ৬২৫০ জনের ফিস দেয়া যাবে। মিজানের মতো ৬২৫০ জন পরীক্ষা দিতে পারবে!

হিসাবটা মাত্র ১ কোটি টাকার

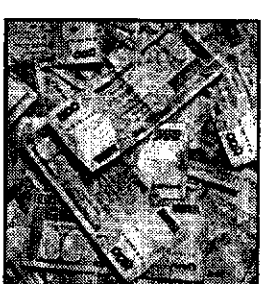

ঋণের অভাবে ছোট্ট একটা মুরগির ফার্ম চালু করতে পারেননি জমিলা বেওয়া। ছয় মাস কয়েকটা এনজিওতে ধরনাও দিয়েছেন। তারা বলেছে, আজ দেবে, কাল দেবে, কিন্তু দেয়নি। অথচ অনেকেই কেমন করে যেন ফার্ম দিয়ে করে-টরে খাচ্ছে। স্বামীহারা জমিলা বেওয়া অন্ধকার দেখেন ছয়-ছয়টা ছেলেমেয়ে নিয়ে এবং অন্ধকার দেখতে দেখতেই আত্মহত্যা করে বসেন একদিন টুক করে!

১ কোটি টাকায় এরকম ১০০০ জনকে ঋণ

দেওয়া যাবে। জমিলা বেগমের মতো ১০০০ জন অন্ধকার দেখা মানুষকে আত্মহত্যার পথ থেকে বাঁচানো যাবে!

সেলিম নামে একটা ছেলে ঈদের দিন শব্দ করে কাঁদছিল মিরপুরের বাঁধের ওপর বসে। কারণ ঈদে রংপুরে তার বাড়ি যেতে পারেনি সে। তার কাছে কোনো টাকা নেই। সকালে ঈদের কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া তো দূরের কথা, কোনো খাবারই পেটে পড়েনি তার। হয়তো পড়বেও না। অথচ মাকে কথা দিয়েছিল, তার জন্য একটা শাড়ি কিনে সে বাড়ি ফিরবে ঈদের আগের দিন।

শাড়ি কিনে সে বাড়ি ফিরতে পারত, যদি তার ওজন মাপার যন্ত্রটা থাকত, সেটা চুরি না হয়ে যেত। সে যেখানে থাকে সেখান থেকে পাঁচদিন আগে চুরি হয়ে গেছে জিনিসটা। রাস্তায় সেটা নিয়ে বসলে কমপক্ষে পঞ্চাশটি টাকা রোজগার হতো প্রতিদিন। সে রোজগার বন্ধ, তাই খাওয়াও বন্ধ, মায়ের জন্য শাড়ি কেনাও বন্ধ, বাড়ি যাওয়াও বন্ধ! অথচ ওই মেশিনটার দাম মাত্র চারশ' টাকা!

১ কোটি টাকায় এরকম ২৫০০০টি ওজন মাপার মেশিন কেনা যাবে, ২৫০০০ জনের চোখের পানি বন্ধ করা যাবে!

বেঁচে থাকার জন্য ১ কোটি টাকা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, অনেকের জন্য করা যায়। অথচ এই ১ কোটি টাকাই কত সহজে খরচ করে ফেলে মানুষ। ঘুষ খেয়ে বাড়ি বানিয়ে খরচ করে, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে গাড়ি কিনে খরচ করে, দেশের সম্পদ লুট করে বিলাসিতায় খরচ করে!

খরচ হয় আরো অনেক উপায়ে—প্রধানমন্ত্রীকে তুষ্ট করতে গিয়ে সরকারি তহবিলের প্রায় ১ কোটি টাকার অপচয় করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উপেক্ষা করে তার বসবাসের জন্য গণপূর্ত অধিদফতরের অতি-উৎসাহী কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার অতিরঞ্জিত সাজসজ্জার পেছনে এ অর্থ ব্যয় করেছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী বসবাসের জন্য যমুনায় উঠছেন না শেষ পর্যন্ত! [সমকাল]

হায় টাকা! ১ কোটি টাকা!

সাবের সিদ্দিকীর ২২,৬৩০ দিনের জীবনে তিনটি দিনের কথা কখনোই ভুলতে পারবেন না। আর সেই তিনটি দিনের প্রথম দিনটি হচ্ছে—তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মের দিন। বৃষ্টি ছিল সেদিন, মুষলধারে বৃষ্টি। কাছে পিঠে কোথাও হাসপাতাল নেই, অতি নিকটে (!) যে হাসপাতালটা আছে সেটা বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে। একে তো বৃষ্টি, তার ওপর কোনো যানবাহনও নেই। অথচ পোয়াতি বউটার ব্যথা উঠেছে, অল্প অল্প চিৎকার করছে সে। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া দরকার তাঁকে। কী করা যায়, কী করা যায়—এটা ভাবতে ভাবতেই মাথায় একটা বুদ্ধি এসে যায় তাঁর। বৃষ্টিটা কমে এসেছে এরই মধ্যে। চারটা বাঁশ দিয়ে মাচা বানিয়ে, তার ওপর বউকে শুইয়ে চাচাতো এক ভাইকে সাথে নিয়ে পৌঁছে যান হাসপাতালে। কাঁধের মাংস ততক্ষণে বসে গেছে তিন ইঞ্চি, বুকটা লাফাতে শুরু করেছে ইচ্ছে মতো, নিঃশ্বাস ছাড়ছেন ঘন ঘন। কিন্তু সব কষ্ট দূর হয়ে যায় তখনই, যখন নবজাতকের রক্তিম মুখটার দিকে তাকান, তার নরম চামড়ার গালটা স্পর্শ করেন, তার মুষ্টিবাঁধা হাতটা নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ান।

বুকের সমস্ত ভালোবাসা সেদিন তিনি তাঁর প্রথম সন্তানকে দিয়েছিলেন, তারপর আরো দিয়েছিলেন।

ভালোবাসার প্রতিদান

দ্বিতীয় দিনটি হচ্ছে—তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদিন। সেদিন সন্তান জন্ম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবনটা যায় যায়। ডাক্তার বলেছিলেন, যে কোনো একজনকে বাঁচানো যাবে—হয় সন্তান, নয় মা। স্রষ্টার কাছে জীবনে তেমন কিছু চাননি সাবের সিদ্দিকী, সেদিন হাত তুলে চেয়েছিলেন, কেঁদে কেঁদে চেয়েছিলেন। স্রষ্টা তাঁর চাওয়াটা দিয়েছিলেন—মা-সন্তান দুজনই বেঁচেছিলেন, এখনও বেঁচে আছেন।

দু'ছেলের পর একটা মেয়ের আশায় আরো

একটা সন্তান নেন সাবের সিদ্দিকী। কিন্তু তৃতীয় সন্তানটাও ছেলে হিসেবে পৃথিবীতে আসে। মনটা খারাপ হয়ে যায় তাঁর। একটু পরই তিনি উপলব্ধি করেন—মন খারাপ করা ঠিক হচ্ছে না, আল্লাপাক যা দিয়েছেন ভালোর জন্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর নবজাতককে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চান স্রষ্টার কাছে।

সাধারণত বুড়ো কোনো রিকশাওয়ালা দেখলে তাঁর রিকশায় উঠি না আমি। অন্য কোনা কারণ নেই, কেবল একটা অপরাধবোধে ভুগি আমি—ধ্যাত, বুড়ো মানুষটা কষ্ট করে রিকশা চালাচ্ছেন, আর আমি বসে বসে যাচ্ছি। সেদিন কোনো রিকশা না পেয়ে অগত্যা একটা বুড়ো মানুষের রিকশাতেই উঠতে হলো। কিন্তু ওঠার পরই খারাপ লাগাটা শুরু হয়ে গেল। অনেক কষ্টে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েই লোকটি হাঁপাতে থাকেন, ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকেন, বুকটা হাপরের মতো ওঠা নামা করতে থাকে তাঁর। সত্যি সত্যি কষ্টে মরে যাই তখন। অপরাধী কণ্ঠে বলি, 'খুব কষ্ট হলো আপনার।'

'হ্যাঁ, কোনোদিন চালাইনি তো!'

'আজ হঠাৎ চালালেন যে?'

মাথা নিচু করে ফেললেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, 'তিনটা ছেলে আছে আমার। সেই ছেলেদের সারাজীবন বুকের ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ করতে পারিনি। এটা আমার ব্যর্থতা! এই ছোট্ট বুকে তিনজনকে ঠাঁই দিয়েছিলাম, কিন্তু ওদের তিনজনের একজনের বুকেও আমার কোনো ঠাঁই হয়নি, ওদের মায়েরও হয়নি। তাই...।' মাথাটা নিচু করে ফেলেন তিনি আবার, বিড় বিড় করে বলে গেলেন আরো অনেক কিছু।

রাতটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি—মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদটা। মানুষের মানবতাহীনতার লজ্জায়, মনুষ্যত্ব পতনের লজ্জায়! কী জানি, চাঁদটা সেই যে ডুবে গেল, আর উঠল না।

প্রিয় পাঠক, যদি কখনো মিরপুর ২ নম্বরে প্রশিকা বিল্ডিংয়ের রাস্তাটায় যান; ছোট-খাটো ফরসা একটা লোককে দেখেন; মুখে দাড়ি, চোখ টলটল করা চেহারা, মাটির মতো শান্ত অবয়ব এবং যাকে দেখা মাত্র আপনার বাবার কথা মনে পড়বে-তিনিই হচ্ছেন সাবের সিদ্দিকী। সন্তানদের যিনি সমস্ত ভালোবাসা দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি এখন রিকশা চালান, হয়েছেন রিকশাওয়ালা!

খুব স্টাইল করে কথা বলছে ছেলেটি, 'এই বরই...বরই, মিষ্টি বরই... ।' রাস্তার পাশ দিয়ে যেই যাচ্ছেন ফিরে তাকাচ্ছেন ছেলেটির দিকে। প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা, বাম কানে একটা ছোট দুল, হাতে অনেকগুলো ব্রেসলেট, পরনে বহু পকেটওয়ালা প্যান্ট, হাতা-কাটা গেঞ্জি আর চমৎকার একটা কেডস পরেছে সে। পুরোপুরি একটা স্মার্ট ছেলে! মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও খারাপ হয়ে গেল—এরকম একটা ছেলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বরই বিক্রি করছে!

ফাঁকে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে দেখছি আমি। আমার চেয়ে দু'-চার বছর ছোট হবে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনের কাছে বিক্রিও করে ফেলল কয়েক কেজি বরই। অথচ আশপাশের দোকানদাররা বসে আছেন চুপচাপ, ছেলেটির মতো বিক্রি করতে পারছেন না ঝটপট।

দুটো মেয়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। ছেলেটা দ্রুত তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা এক করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলল, 'এক্সকিউজমি ম্যাডাম, একটা বরই যদি খেয়ে দেখতেন।'

লম্বা মতো মেয়েটি বলল, 'বরই খাব কেন?'

'কারণ, একটা বরই খেলে আপনার আরো বরই খেতে ইচ্ছে করবে আর আরো বরই খেতে ইচ্ছে করলে আপনি বরই কিনবেন আর বরই কিনলেই আমার কিছু লাভ হবে আর সেই লাভের টাকা দিয়ে আমি আমার সংসার চালাতে পারব।'

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি এবং হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আপনার সংসার আছে?'

'হ্যাঁ, আমার মা আছেন, আমার বাবা আছেন।'

মেয়েটি আগের চেয়ে জোরে হেসে বলল, 'অ, আমি তো ভেবেছি এক ডজন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন আপনি। দিন, এক কেজি বরই দিন।'

'একটা খেয়ে পরীক্ষা করে নেবেন না?'

অমানুষ!

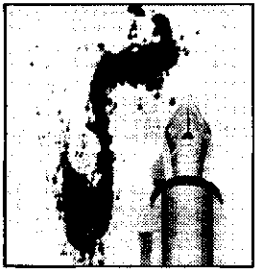

'না, পরীক্ষা করতে হবে না।'

বরই মেপে দিল ছেলেটি, মেয়ে দুটো খুশি মনে চলে গেল সেগুলো নিয়ে। ছেলেটা আবার বলতে লাগল—বরই...বরই, মিষ্টি বরই...।

ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, কাঁধে একটা হাত রাখলাম তার। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সে। আলতো করে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'অ্যানি কোশ্চেন?'

'আপনার নাম?'

'বাবা ডাকেন হিমু বলে, মা ডাকেন হিমেল, বন্ধুরা ডাকে হিমিল্যা আর একমাত্র ভাগিনা ডাকে—মামা। অবশ্য আরো একজন অন্য একটা নামে ডাকত, অনেকদিন আগে ডাকত, এখন ডাকে না বলে ভুলে গেছি সেই ডাকটা।'

'এখন ডাকে না কেন?'

'মানুষ তো মানুষকেই সবচেয়ে আন্তরিকতা নিয়ে ডাকে। আমি হয়তো এখন মানুষ নই।'

'মানুষ না কেন আপনি?'

'ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যারা জিনিস বিক্রি করে তারা আবার মানুষ হয় নাকি!'

'তারা মানুষ না?'

'অনেকে ভাবেন।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু আমি এই কাজটা কেন করছি। শুনুন মানুষ মশাই, রাজশাহী ভার্সিটি পাশ করেছি সেই ছয় বছর আগে, চাকরি পাইনি। একদিন দেখি, বড় ভাই-ভাবি, মেঝ ভাই-ভাবি আমাকে, আমার বাবাকে, আমার মাকে মানুষ মনে করছেন না। চলে এলাম সেই পঞ্চগড় থেকে—নিজেকে নিয়ে, মাকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে। তারপর এই নাগরিক শহরে। আচ্ছা, আপনি কী বলেন—আমি কি এখন মানুষ নেই?' ছেলেটা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠে বলে, 'কেউ না জানুক, তুমি তো সাক্ষী প্রভু, আমি আমার বাবার চরণ ছুঁয়ে, মায়ের চরণ ছুঁয়ে মরতে চাই, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই এই ফুটপাতে দাসত্ব করে। কোন বালিকা তাতে চলে গেল, কোন আত্মীয় অমানুষ ভাবল, কে ভাবে এসব। তুমি সাক্ষী থেকো প্রভু, আমি আমার বাবার পা ছুঁয়ে, মায়ের পা ছুঁয়ে মরতে চাই। এই যে বরই...বরই, মিষ্টি বরই...।'

বকবক করা কোনো রাজনীতিবিদের মতো গান গেয়ে চলছে একটা ছেলে। সে গান গাচ্ছে পিকনিকে যাওয়া একটা বাসের ভেতর থেকে। খালি গলায় গাওয়া তার গানে না আছে কোনো সুর, না আছে কোনো ছন্দ। কিন্তু আপন মনে সে গেয়েই চলছে। মাইকে ভেসে আসা তার তীব্র কর্কশ শব্দে হঠাৎ আমাদের বাসের ভেতরের এক বৃদ্ধ মানুষ কানে হাত দিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'স্টপ!' কিন্তু তাঁর এই স্টপ বলা এ বাস থেকে ওই পিকনিকের বাসে পৌঁছল না। গানও তাই থামল না। মুক্ত হস্তে দান করার মতো মুক্ত গলায় সে গেয়েই চলছে। ব্যস্ততম ঢাকা শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে, মানুষদের যন্ত্রণা দিয়ে, শব্দ দূষণে একাকার করে পিকনিকের বাসটা এগিয়ে চলছে, কেউ কিছু বলছে না। সবাই যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হায়!

২

খুব আরাম করে সিগারেট খাচ্ছেন পুলিশটি। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদের ভ্যানগাড়ির ভেতর বসে। মিরপুরের ২নং থানার পাশে। মুগ্ধ হয়ে আমরা বেশ কয়েকজন একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে তা দেখলাম। পুলিশ হচ্ছে জনগণের বন্ধু, সেই বন্ধু যদি পাবলিক প্লেসে সিগারেট খান, তাহলে সাধারণ জনগণ তো সিগারেট খাবেই। অথচ আইন ছিল-প্রকাশ্যে সিগারেট খেলে ৫০ টাকা জরিমানা। কে এসব দেখবে, কে জরিমানা আদায় করবে?

কাকতাড়ুয়া

৩

কথাটা আগেও একবার বলা হয়েছিল-দেশে অনেক কিছু শেখানোর প্রতিষ্ঠান আছে; কম্পিউটার শেখানোর প্রতিষ্ঠান আছে, রান্না শেখানোর প্রতিষ্ঠান আছে, গান শেখানোর প্রতিষ্ঠান আছে, চুল ঠিক করার প্রতিষ্ঠান আছে, গা ম্যাসেজ করার প্রতিষ্ঠান আছে, কত কত

প্রতিষ্ঠান আছে, অথচ মানুষকে সঠিকভাবে মানুষ করার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখানো হয়, কিন্তু এর বাইরেও যে অনেক কিছু শেখানোর আছে—রাস্তার ধারে প্রশ্রাব করতে হয় না, যেখানে সেখানে হাঁচি দিতে হয় না, যত্রতত্রভাবে হাঁটতে হয় না। এই যত্রতত্রভাবে হাঁটার জন্য একটা আইন করা হয়েছিল। যত্রতত্রভাবে হাঁটলে ২০০ টাকা কিংবা তার কম বা বেশি টাকা জরিমানা। আইনটা কি এখনো বলবৎ আছে? থাকলে মানুষ এভাবে যত্রতত্রভাবে হাঁটে কেন, কেন মানুষ জটলা করে হাঁটে?

৪

বাসে চড়ে যারা চলাফেরা করেন, তারা একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন, আর সেটা হচ্ছে—বাসের ভেতর মোবাইলে কথা বলা। প্রয়োজন হলে মানুষ কথা বলতেই পারে, কিন্তু বাসের ভেতর মোবাইলে এমন সব কথা বলা হয়, যা ভদ্রলোকেরা তাদের বাড়ির আশপাশেও এসব বলেন না; তাঁরা যে শব্দ করে কথা বলেন, অনেকে তাঁদের ড্রইংরুমেও এত শব্দ করে কথা বলেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁরা যে শব্দ করে কথা বলেন তাতে মোবাইলে কথা না বলে তাঁরা যদি খালি গলায় কথা বলতেন তাহলেও ওপাশের লোকটা শুনতে পাবেন সবকিছু। আচ্ছা, এ বিষয়ে কোনো আইন করা যায় না?

৫

প্রতিটা সিএনজি অটো রিকশার পেছনের তিনটা মোবাইল নাম্বার থাকে। সিএনজি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে সেই নাম্বারগুলোতে ফোন করতে বলা হয়েছে। অনেকে সমস্যায় পড়েছেনও। কিন্তু ওই মোবাইলগুলোতে ফোন করে ওপাশের মানুষগুলোর কাছে পৌঁছতে পারেনি অনেকেই। তাহলে এই নাম্বারগুলো কীসের জন্য? আমার মনে হয় মানুষ এখন সবচেয়ে যন্ত্রনায় ভোগে সিএনজি নিয়ে। বিশটা সিএনজির চালককে অনুরোধ করার পর একটা সিএনজি রাজি হয় কাঙ্খিত জায়গায় যাওয়ার, তাও অন্তত বিশ টাকা বেশি দিতে হয়!

জনপ্রিয় উন্মাদ পত্রিকায় একটা কার্টুন ছাপা হয়েছিল—এক জোড়া পা দেখা যাচ্ছে, আরেক লোক সেই পা জোড়া চেপে ধরে কাঁদছেন আর কী যেন বলছেন। বলতে হবে—লোকটি কার পা চেপে ধরছেন, কেন ধরেছেন আর কী বলছেন?

পরের পৃষ্ঠায় উত্তরটা ছিল—লোকটি একটা রিকশাওয়ালার পা চেপে ধরে আছেন আর কেঁদে কেঁদে বলছেন, দয়া করে তুমি রিকশায় বসো, আমি তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাই। গন্তব্যে পৌঁছার পর তোমাকে ভাড়াটাও দিয়ে দেব আমি!'

ঘুম থেকে উঠে জানালা খুলেই দেখি—তুমি। কিছুটা চমকে উঠলাম আমি। তোমাকে এভাবে দেখব আশা করিনি কখনো। কখনো ভাবিওনি তুমি এভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। অথচ তুমি ছিলে অন্যরকম। অন্তত তুমি এভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করতে সবসময়—একটু অন্যরকম, একটু অন্য ধরনের।

ঠিক মনে করতে পারছি না, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল। তবে এটা মনে আছে, পরনে অন্যরকম একটা পোষাক ছিল তোমার। কথাও বলছিলে হাসি হাসি মুখ করে, হাত নেড়ে নেড়ে এবং শব্দ করে।

খুব ভালো কথা বলতে পারতে তুমি, মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তোমার কথাগুলো শুনত, তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখত। তোমার কথা বলার মধ্যে যে জিনিসটা সবাইকে অবাক করে দিত—সেটা হচ্ছে তোমার কৌতুক বোধ। কথার ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত কিছু কৌতুক বলতে তুমি। মানুষজন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরত।

জানালাটা বন্ধ করে দিলাম আমি। আপাতত তোমাকে দেখব না। আগে সকালের কাজগুলো সেরে নেই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব, তোমাকে দেখব। জানি-তুমি এতে মন খারাপ করবে না, অভিমানও না। কারণ তুমি এখন সেই অবস্থায় নেই, যে অবস্থায় থাকলে মানুষের বোধ কাজ করে, সচেতনতা কাজ করে, মানুষ নিজেকে মানুষ ভাবে।

ফোনটা বেজে উঠল। আমি জানি কে ফোন করেছে। কিন্তু ধরতে ইচ্ছে করছে না। বাজতে বাজতে থেমে গেল ফোনটা। কয়েক সেকেন্ড, বেজে উঠল আবার। কিছুক্ষণ বাজতে থাকল। বিরক্তিকর। ফোনটা রিসিভ না করা পর্যন্ত বাজতেই থাকবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

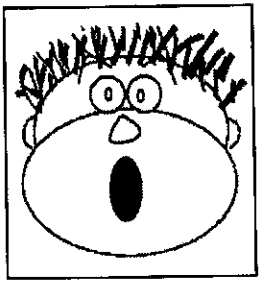

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেলাম ফোনটার দিকে। রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাতেই ওপাশ থেকে বলল, 'দেখেছ?'

আমি জানি, কী দেখার কথা বলছে সে। তবুও না বোঝার ভান করে বললাম, 'কী?'

'ওই যে তোমার প্রিয় মানুষটা।'

'তোমার ওখানেও...!'

কথাটা শেষ করতে দিল না সে। তার আগেই বলল, 'হ্যাঁ, জানালা খুলেই তো দেখলাম।'

'ওখানেও!'

'হ্যাঁ। ব্যাপার কী বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কিছু জানো না তুমি?'

'না।'

ফোনটা রেখে দিলাম আমি। দ্রুত সকালের সব কাজ সেরে বাইরে বের হয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আবার দেখতে পেলাম। তাকিয়ে আছো পলকহীন চোখে, চুপচাপ, নিশ্চুপ।

মাথাটা ধরে উঠল হঠাৎ। কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, তেমন কাউকেও খুঁজে পাচ্ছি না। কী যে করি!

সমস্ত শহরটা ঘুরে দেখা দরকার। একটা রিকশা ঠিক করে ঘুরতে লাগলাম সারা শহরটা। সারা শহরেই তুমি। যেদিকে তাকাই কেবল তুমি আর তুমি। গাছের সঙ্গে তুমি, দেয়ালের সঙ্গে তুমি, বিলবোর্ডের সঙ্গে তুমি-তুমি আর তুমি। একটা দুই ফুট বাই তিন ফুটের পোস্টারে কেবল তোমার ছবি। সেই পোস্টারের ওপরে লেখা-মোস্ট ওয়ান্টেড, আর নিচে লেখা-ধরিয়ে দিন। পুরস্কার নগদ দশ লাখ টাকা!'

দূর থেকে চিৎকারটা বেশ জোরেই শোনা গেল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কীসের চিৎকার। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, সব কিছু শান্ত, স্বাভাবিক। যাক, চিৎকারটা কেউ দুষ্টমি করে দিয়েছে, কোনো অঘটন ঘটেনি। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই আরেকটা চিৎকার, হঠাৎ। সামনের দিক থেকে এসেছে চিৎকারটা। সেদিকে তাকালাম। দূরে একটা গাড়ি থেমে আছে, তার চারপাশে অনেকগুলো মানুষ, দাঁড়িয়ে আছেন তারা গোল হয়ে। কোনো অ্যাকসিডেন্ট! বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলাম সামনের দিকে। গাড়ির পাশে মানুষজন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

আরেকটা চিৎকার ভেসে এল আবার। বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠল আবার। পা দুটো আরো দ্রুত চালিয়ে এগুতে লাগলাম। গাড়িটার সামনে এসে বুঝতে পারলাম সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি এটা। গাড়িটা পার হয়ে পেছনের দিকে যেতেই চমকে উঠলাম—তিনটা কুকুর পড়ে আছে রাস্তায়। স্থির হয়ে শুয়ে আছে, মরে গেছে তারা কিছুক্ষণ আগে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভালো করে কুকুরগুলোর দিকে তাকাতেই আগের চেয়ে বেশি চমকে উঠলাম, আগের চেয়ে আরো বেশি মন খারাপ হয়ে গেল আমার।

শ্রেষ্ঠ

রূপনগরের ঢাল রাস্তার পাশে যে ছোট ছোট চায়ের দোকান আছে, ছুটির দিনগুলোতে বিকেলে আমরা কয়েকজন মিলে সেখানে বসি। চা খাই, গল্প করি। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়, কুশল বিনিময় হয়, আড্ডাও হয়। কোনো কোনো দিন সকালেও বসি, তখনও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়, আড্ডা হয়। সব

কিছু ছাড়িয়ে আরো একজনের সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের, একটা কুকুরের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় কুকুরটা আমাদের দেখেই লেজ নাড়ত, দৌড়ে এসে কু কু শব্দ করে পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ত, কাছ ঘেষে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু আমরা তার জন্য তেমন কিছুই করিনি—কোনো প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা করিনি, ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করিনি, কখনো কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে চাইনিজ খাওয়াতেও নিয়ে যাইনি, এমনকি স্বার্থ আদায়ের জন্য গোপন কোনো সুবিধাও দেইনি। কেবল তার দিকে এক টুকরা, দুই টুকরা বিস্কুট ছুঁড়ে দিতাম। রাস্তায় পড়ে থাকা কুকুরগুলোর মাঝে ওই কুকুরটাও পড়ে আছে, সিটি কর্পোরেশনের লোকজন বে-ওয়ারিশ কুকুর নিধনের মাঝে তাকেও নিধন করে ফেলেছে। বুকটা অসম্ভব ভারী হয়ে গেল আমার। হায়, আর কখনো ওই প্রাণীটি আমাদের দেখে দৌড়ে আসবে না, পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে কু কু শব্দ করবে না। করবে না? বুকটা ক্রমান্বয়ে ভারী হতে থাকে আমার!

রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি—ওই কুকুরটা আমাকে একটা চিঠি লিখেছে।

মাননীয় মানুষ

আচ্ছা, আপনারা মানুষেরা যে জীবকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটা কে বলেছে? কে আপনাদের শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছে? যদি বলি আমরা, আমরা নির্বোধ প্রাণীরাই শ্রেষ্ঠ, তাহলে কি ভুল হবে? আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, ভুল হবে না। কারণ, আপনারা যেমন নির্দ্বিধায় আরেকটা মানুষকে খুন করেন, আমরা তেমন আরেকটা কুকুরকে খুন করি না। আপনারা যেমন জোরপূর্বক অন্যের জমি দখল করেন, আমাদের মাঝে তেমন দখলদারিত্বের মনোভাব নেই। আপনারা দায়িত্ব পালনের নামে অন্যকে ফাঁদে ফেলে ঘুষ খান, অবৈধ সুবিধা নেন, আমরা তেমন কিছু করি না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আপনারা যেমন বাজে লোকদের সঙ্গে আপোষ করেন, আমরা ক্ষমতালোভীও নই, আপোষ করার প্রয়োজনও হয় না তাই আমাদের। আমরা আপনাদের মতো স্বার্থপরও নই। এবার বলুন, কে শ্রেষ্ঠ—আপনারা, না আমরা?

একটা কথা বলি। পর জনমে স্রষ্টা যদি আমাকে কখনো বলেন, তোমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠালে কী হিসেবে যেতে চাও? আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলব-দু পাওয়ালা কোনো প্রাণী হয়ে নয়, চার পাওয়ালা প্রাণী হয়ে, স্রেফ কুকুর হয়ে!

খুব আশ্চর্য হয়ে একদিন তুমি নীল ঘাসফুল দেখবে, ভাববে—কী সাধারণ একটা ফুল! অথচ তুমি জানো না, এত ক্ষমতাশালী মানুষের এরকম সাধারণ একটা ফুল তৈরি করার ক্ষমতা নেই! এর চেয়ে সুন্দর করে প্লাস্টিকের কোনো ফুল হয়তো তারা তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেই ফুল দেখে তোমার ছুঁতে ইচ্ছে করবে না, চোখের একেবারে সামনে আনতে ইচ্ছে করবে না, তোমার কোনো অনুভূতিই কাজ করবে না সেটা দেখে। তবু মানুষের কী বড়াই!

তুমি যখন একা একা ঘাড় উঁচু করতে পারবে, উপরে তাকাতে পারবে, তখন দেখবে—কোনো এক খেজুর গাছের ডালে ছোট ছোট বাবুই পাখি বাসা বাঁধছে। তুমি একটুও অবাক হবে না, সামান্য একটা বাসা! কিন্তু তুমি একটু ভালো করে তাকালেই দেখতে পাবে-কী নিপুণভাবে বাসাটা বোনা হয়েছে! মানুষ এত কিছু বানায়, এত কিছু তৈরি করে, তার আগে তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়, লেখাপড়া করতে হয়, অনেক পরিশ্রম করতে। তারপরও ত্রুটি থেকে যায় তার মধ্যে। অথচ একটা পাখি, ছোট্ট একটা পাখি, যেভাবে তার বাসা বানায়, মানুষের সৃষ্টিকে সেখানে খুব নগন্য মনে হবে তোমার। তবু মানুষের কী অহংকার!

সুমর্মির কাছে খোলা চিঠি

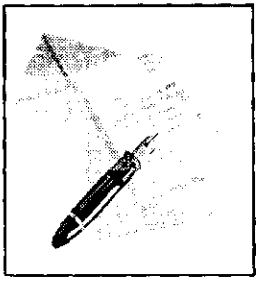

তোমাকে একটা কথা বলি। বাবা বলেছিলেন কথাটা। মানুষকে হতে হয় গাছের মতো। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন সেটাকে কোনো বাচ্চা ছেলে উপরে ফেলতে চায়। যদি ওই চারা গাছ ওই সময় বেঁচে যায়, সেই গাছ যখন আরো একটু বড় হয়, তখন ছাগল কিংবা অন্য কোনো প্রাণী সেটাকে খেয়ে ফেলতে চায়। গাছটা যদি এটা থেকেও বেঁচে গিয়ে আরো একটু বড় হয়, তখন বড় কোনো মানুষ তার ডাল কিংবা মূল কাণ্ড ভেঙে দিতে চায়। গাছটা এ যাত্রা বেঁচে গিয়ে যখন

আরো বড় হয়, তখন প্রকাণ্ড কোনো ঝড় এসে তাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে চায়। এটা থেকেও গাছটা যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় একদিন। শেকড় বিছিয়ে দেয় মাটির গভীরে, ভাঙন থেকে রক্ষা করে মানুষের বাসস্থান। ডানপালা মেলে দেয় চারপাশে, পাখি বাসা বাঁধে সেখানে; আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম করে নিরাপদে। সেই গাছ তারপর ফল দেয়, সেই ফল মানুষ খায়, পাখি খায়, প্রাণী খায়। প্রখর রোদ্রে মানুষ তার তলায় বসে ছায়া নেয়। অথচ এ গাছটাকেই মানুষ আর প্রাণীরা মিলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল একদিন। সেই গাছ-ই এখন সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, পরের জন্য, অন্যের জন্য।

প্রিয় সুমর্মি, তুমিও একদিন বড় হবে, গাছের মতো তোমার সামনেও অনেক সমস্যা আসবে, বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। ভয় পেও না। এসব সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে তোমাকে বড় হতে হবে, পরের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে।

খুব কঠিন কিছু বলে ফেললাম তোমাকে? শোনো মেয়ে, জীবন এর চেয়েও কঠিন, যদি তুমি জীবনের মানে বোঝো। একদিন তোমাকে রাস্তায় চলতে হবে। তোমার গন্তব্যে পৌঁছার আগে তোমার রাস্তায় কোথাও গর্ত থাকতে পারে, তোমাকে সে গর্ত পাশ কেটে যেতে হবে; কোথাও পানি জমে থাকতে পারে, তোমাকে সেটা এড়িয়ে যেতে হবে; কোথাও কোনো বর্জ্য পরে থাকতে পারে, সেটাও তোমাকে দেখতে হবে। তাহলেই তুমি তোমার গন্তব্যে নির্ভেজালভাবে পৌঁছতে পারবে। তোমাকে এটা করতে হবে, না হলে তুমি আর মানুষ থাকবে না, যেমনটা অনেকেই থাকতে পারে না।

তোমাকে এতসব কথা কেন বলছি? কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে-মানুষ হয়ে তুমি জন্মেছো, মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছো।

খুব খারাপ একটা কথা বলব এখন তোমাকে, মনে রেখ। কথাটা কোনো একটা জায়গায় পড়েছিলাম। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—মানুষকে ভালোবাসলে মানুষ কষ্ট দেয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে; কোনো প্রাণী সেটা করে না!

কথাটা তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে শুনছেন। চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়ালে, বাজারের ভেতর ঘোরাঘুরি করলে, কোথাও কোনো আড্ডার পাশ দিয়ে গেলে কথাটা শুনতে পান তিনি। কথাটার মানে তিনি বুঝতে পারেন, খুব ভালো করেই বুঝতে পারেন, তবু কোথায় যেন একটা 'অ-বোঝা' রয়ে যায়। ঠিক বোঝা হয়ে ওঠে না কথাটা। কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন তিনি, অভাবের কারণে আর পড়া হয়ে ওঠেনি। এই অল্প বিদ্যাতেই তিনি যা বুঝতে পারেন, তাঁর নিজের ধারণা অনেকে তাও বুঝতে পারে না।

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় বাংলা স্যার একদিন বলেছিলেন, 'তোমাদের মাঝে আজ কার মন সবচেয়ে ভালো, বলো তো?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'স্যার, আমার।'

'কেন তোমার মন ভালো?'

'আমি আজ আমার মা'র কথা শুনেছি।'

'তোমার মা তোমাকে আজ কী বলেছিলেন?'

মাথা নিচু করে ছিলেন তিনি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মাথাটা সামান্য উঁচু করে বলেছিলেন, 'আজ সকালে আমাদের কোনো খাবার ছিল না। আমি স্কুলে আসতে চাইনি। কিন্তু মা এমনভাবে বলল, তাই চলে আসলাম।'

বাংলা স্যার সেদিন ক্লাস শেষে স্কুলের পাশের এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাইয়েছিলেন তাকে। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, উপদেশ ধরনের কথা বলেছিলেন। তিনি সেই উপদেশগুলো এখনো মেনে চলেন। এই ষাটোর্ধ বয়সে কখনো কোনো সমস্যায় পরলে স্যারের কথা মনে করেন এখনো!

মাঝে মাঝে একটা কথা তিনি প্রায়ই ভাবেন, কাছের কাউকে কাউকে বলেও ফেলেন—সংসার করা ঠিক হয়নি তাঁর। এই 'ঠিক না হওয়া'টা যতটা না

আফসোস

নিজের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘরে যে মানুষটাকে এনেছেন তার জন্য। মানুষটার প্রতি সামান্যতম দায়িত্ব পালন করতে পারেননি তিনি। কোনো সাধ-আহ্লাদই পূরণ করতে পারেননি, অভাবে রেখেছেন সব সময়।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তবে তার নিজের মনে হয় সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছেন সেদিন, যেদিন তাঁর বড় ছেলে আলাদা হয়ে যায়। অথচ এই ছেলেটার জন্য তিনি কী না করেছেন। আগের দুটো ছেলে জন্মের পরপরই মারা যাওয়ায় তিনি মানত করেছিলেন একটা ছাগল জবাই করে তিনি গরিবদের খাওয়াবেন। তিনি নিজের শেষ সম্বল এক খণ্ড জমি বিক্রি করে সেই কাজটা করেছিলেনও। এখন অবশ্য মনে মনে বলেন, ভালোই হয়েছে চলে গিয়ে, এই অভাবের সংসারে যার যার মতো থাকাই ভালো। পাখিরাও তো তাই করে, বনের প্রাণীরাও তো তাই করে। আচ্ছা, পাখিরা করলে কি মানুষদেরও করতে হবে। তাহলে মানুষ আর পাখির মধ্যে পার্থক্য রইল কি? তিনি আর কিছু ভাবতে চান না।

বাংলা স্যার এখনো বেঁচে আছেন। তিনি আর এখন তেমন চোখে দেখেন না, কথাও বলেন থেমে থেমে। খুব মন খারাপ হলে কিংবা একা একা লাগলে অথবা কোনো কিছু করার না থাকলে তিনি স্যারের কাছে চলে যান। এটা ওটা কথা বলেন, পরামর্শ করেন, পুরনো গল্প করেন। স্যারের বাসার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যার কী করে টের পান তিনি এসেছেন, গলাটা একটু উঁচু করে তিনি বলেন, 'কফিল? এসো ঘরে এসো।'

স্যারের বাসার কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজও তাঁকে ঘরে আসতে বললেন। তিনি ঘরে ঢুকেই স্যারকে বললেন, 'স্যার, কয়েকদিন ধরে বিশ্বমন্দা নিয়ে কথা শুনছি। ব্যাপক আলোচনা চলছে এই শব্দটি নিয়ে। অনেক দেশে নাকি এর প্রভাব পড়েছে, আমাদের দেশেও নাকি পড়েছে।'

'হ্যাঁ পড়েছে।'

'কিন্তু কই স্যার, আমার ওপর তো পরেনি। সেই আটাশ বছর আগে রাতে ভাত রেঁধে আমি আর আমার বউ খেতাম, কিছু রেখে দিতাম পান্তা বানিয়ে। সকালে উঠে সেগুলো খেতাম। তারপর সারাদিন না খেয়ে কাটানো। কোনো কোনো দিন সকাল-দুপুর-রাতেও। সেই আটাশ বছর আগে যা ছিলাম এখনো তো তাই আছি। বিশ্বমন্দা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, যেমন স্পর্শ করতে পারেনি উন্নয়নে ভেসে যাওয়া দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, উঁচু উঁচু দালানের ছায়া, অবাধ আকাশ, সংস্কৃতির আনন্দ, সবার হাতে পৌঁছে যাওয়া মোবাইল। যেমন স্পর্শ করে না প্রাণীদের।' লোকটি একটু চুপ থেকে শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমরা সারাজীবন স্যার প্রাণীই রয়ে গেলাম, মানুষ হতে পারলাম না!'

মাত্র ১০ টাকার জন্য কয়েকজন বন্ধু মিলে এক বন্ধুকে খুন করার ঘটনা আমরা জানি। আমরা এও জানি, একজন খুনিকে বাঁচানোর জন্য সাবেক এক প্রভাবশালী মন্ত্রীসহ আরো কয়েকজনকে ২০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। গোলটেবিল আলোচনায় টিআইবির তথ্য অনুযায়ী ২০০১-০৬ সালে পানিসম্পদ খাতে ৪৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল। আবার যোগাযোগমন্ত্রীকে প্রায় ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে সচিবালয় দপ্তর সুসজ্জিত করে দিয়েছে সওজ।

মন্ত্রী-সচিব, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য গাড়ি বাবদ ব্যয় হবে ২০৩ কোটি ১ লাখ টাকা। দেশের নদ-নদীর পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেচ কার্যক্রম সচল রাখতে গঙ্গা অববাহিকায় ব্যারাজ নির্মাণ করা হবে। এই ব্যারাজের নির্মাণস্থল, মোট আয়তন, নকশা ইত্যাদি কেবল এইসব সমীক্ষার জন্যই ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা।

সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন সরকারের চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ২৭ লাখ ৮৬ হাজার ৩৬৩ টাকা নেওয়াকে আর্থিক অনিয়ম বলে আখ্যায়িত করেছে জমির উদ্দিন সরকারের দুর্নীতি তদন্তে গঠিত কমিটি। আবার বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ওরফে শাহ আলমের এক বছরে সম্পদ বেড়েছে ৫৬৭ কোটি টাকার!

অনেক টাকার কথা বলা হলো। এসবই পুরোনো খবর। টাকা বিষয়ক নতুন একটা খবর আছে।

৭০,১৩,৬০০ টাকার মধ্যে ১৪,০২৭টি ৫০০ টাকার নোট আছে। কোনোরকম বিরতি বা বিশ্রাম না নিয়ে যদি আপনাকে এই ১৪,০২৭টি ৫০০ টাকার

ওরে, কত্তো কত্তো টাকা রে!

নোট গুনতে দেওয়া হয় তাহলে মোট কতটুকু সময় লাগবে আপনার? এক সেকেন্ডে যদি ২টা নোট গোনা যায় তাহলে ১৪,০২৭টি নোট গুনতে সময় লাগবে ৭,০১৩ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১১৭ মিনিট কিংবা ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট।

আসুন, আরেকটা হিসাব করি। ধরা যাক, আপনি মাসিক ২০,০০০ টাকা আয় করেন। নুন্যতম মর্যাদা বোধ নিয়ে বাস করতে হলে আপনাকে অন্তত খরচ করতে হবে এই পুরো ২০,০০০ টাকাই। কিন্তু ধরে নিচ্ছি আপনি মাসিক ২,০০০ টাকা বাঁচাতে পারেন। তাহলে বছরে আপনি কত টাকা বাঁচাতে পারবেন?

১২ X ২,০০০ = ২৪,০০০ টাকা।

বছরে ২৪,০০০ টাকা হলে ৭০,১৩,৬০০ টাকা জমা করতে কত বছর লাগবে আপনার? ২৯২ বছর! একজন মানুষ কতদিন বাঁচে? গড়ে ৬০ বছর। তাহলে ২৯২ বছর বাঁচতে কতবার জন্মাতে হবে আপনাকে?

৫ বার!

কিন্তু মানুষ মাত্র একবারই জন্মে।

এবার আসল প্রসঙ্গে আসি। এত সব টাকার হিসাব কেন করছি?

কারণ আছে, ছোট্ট একটা কারণ।

বিশ্ব বিখ্যাত ফুটবলার ডেভিড বেকহাম মাত্র এক দিনে আয় করেন ৭০, ১৩, ৬০০ টাকা। বেকহাম এক দিনে যে টাকা ইনকাম করেন সেই টাকা জমা করতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের লাগবে ২৯২ বছর! তার মানে বেকহামের ১ দিন = আমাদের ২৯২ বছর!

হায়! বেকহামের জীবনের কাছে আমাদের সাধারণ জীবন কীসের জীবন? পিঁপড়ার, ছারপোকার, না উঁকুনের! পৃথিবীর অধিকাংশ এই আমরা এত সাধারণ, এত সাধারণ আমাদের জীবন!

মাত্র এক ঘণ্টা পর পর আমাদের বাসাতে বিদ্যুৎ চলে যায় ইদানীং। আমরা কিছুই মনে করি না। গভীর রাতে গভীর ঘুমে আমরা যখন আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, যখন আমরা টুকটাক স্বপ্ন দেখা শুরু করি, নিশুতি রাতে যখন কেবল আকাশের চাঁদ জেগে থাকে একা একা, ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনো আমরা কিছু মনে করি না। ঘামে আমরা ভিজে যাই, আমাদের বিছানা ভিজে যায়, আমাদের বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে অপরিসীম কষ্টে। না, আমরা এতেও কিছু মনে করি না। আমরা তখন দুই ফুট প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু বাতাসের আশায় হা-পিত্যেশ করি, যত্রতত্র গড়ে ওঠা দালানের ফাঁক গলে চাঁদ নয়, চাঁদের আলো দর্শনে উঁকিঝুকি মারি, কখনো কখনো রাস্তার নেড়ি কুকুরের কুকড়ানো চেহারা দেখি, না, আমাদের কিছু মনে হয় না এতে। কেবল তখন জানতে ইচ্ছে করে, আমরা যাদের ভোট দিয়েছি, যাঁরা আমাদের কাঁধে পা রেখে ক্ষমতায় গেছেন, তাঁদের ওখানে কি এভাবে বিদ্যুৎ যায়, তাঁরা কী আমাদের মতো ঘেমে-টেমে নেয়ে যান, তাঁদের বাচ্চারা কি গরমের কষ্টে নীল হয়ে যায়? দুঃখিত, আমরা আসলেই কিছু মনে করি না।

আমরা কিছুই মনে করি না

পাঁচ বছর পর পর একেকজন ক্ষমতায় আসেন। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় সব কিছু। সাইনবোর্ড পাল্টে যায়, চেয়ার পাল্টে যায়, পদ পাল্টে যায়, মানুষ পাল্টে যায়। সবচেয়ে বেশি পাল্টে যায় দখল করার জায়গা। কী নির্লজ্জ সেই দখল প্রক্রিয়া, কী লোভী তাদের আগ্রাসী মন। না, আমরা কিছুই মনে করি না। দেখতে দেখতে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা সত্যি কিছু মনে করি না।

দু-একটা জিনিসপত্রের দাম কমে,

অনেকগুলোর বেড়ে যায়। না, আমরা এতে কিছু মনে করি না। আমরা ৪৮টাকা কেজি আটা খেয়েছি, ৯০ টাকা কেজি তেল খেয়েছি, ৪০টা কেজি চাল খেয়েছি। বেঁচে তো আছি, মরে তো যাইনি। প্রতিবছর আমাদের জীবনযাত্রা আরো কঠিন হয়ে যাবে, জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাবে, আমরা তবু বেঁচে থাকব। না, আমরা সত্যি সত্যি কিছু মনে করি না।

খুব কষ্ট লাগল লোকটাকে দেখে। ফেনী থেকে এসেছেন। টিকাটুলীর মোড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। কারা যেন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে তাঁর সব কিছু। ছিনতাই আগেও হতো, এখনো হয়। না, আমরা কিছু মনে করি না। ছিনতাই কি কেবল আমাদের অর্থ, ঘড়ি, মোবাইলই হয়? আর কিছু হয় না? আমাদের আশা ছিনতাই হয়ে গেছে সেই কবে, বিশ্বাসও ছিনতাই হয়ে গেছে, স্বপ্নও। এত সব ছিনতাইয়ের মাঝেও আমরা হাসি, গল্প করি, বাদাম চিবাই। আমরা সত্যি সত্যি কিছু মনে করি না।

আমরা সত্যি সত্যিই এখন কিছু মনে করি না। আমরা এখন দখল হয়ে যাওয়া চিকন-শুকনো নদী দেখে আনন্দ অনুভবের চেষ্টা করি, আমরা এখন গাছশূন্য বিরান মাঠে শুকনো ঘাস দেখে সুখী হওয়ার চেষ্টা করি, আমরা এখন ধোঁয়ায় ভরে ওঠা আকাশের দিকে তাঁকিয়ে চাঁদ দেখতে না পেয়েও চোখের ভেতর স্বপ্ন জাগিয়ে তুলি। আমরা এখন খেয়ে না খেয়ে থেকে শুধু বেঁচে আছি, এই অনুভবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমরা এখন স্বপ্নহীন, আশাহীন হয়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি, পাছে স্বপ্ন দেখতে পয়সা দিতে হয়, ট্যাক্স দিতে হয়, সেই দেখা স্বপ্ন আবার কেউ দখল করে নিয়ে যায়!

এত যে আশাহীনতা, এত যে ভালোবাসাহীনতা, তবুও কিছুই মনে করি না আমরা। আমরা সত্যি কিছু মনে করি না।

বাসের সিঁড়ির দু ধাপ উঠে আরো একটু এগিয়ে যেতে উদ্যত হলেই পড়ে গেলেন বৃদ্ধ মানুষটি। পাশের সিটে বসে থাকা লোকটি পড়ে যাওয়া মানুষটির হাত ধরে ফেললেন খপ করে। এতে অসন্তুষ্ট হলেন মানুষটি এবং বেশ রাগী চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাত ধরলেন কেন আমার!'

লোকটি একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'আপনি পড়ে যাচ্ছিলেন তো।'

'পড়ে যাচ্ছিলাম, তাতে আপনার কী?'

'বারে, একটা মানুষ চোখের সামনে দিয়ে পড়ে যাবে আর তাকে ধরব না, সাহায্য করব না।'

মানুষটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটির দিকে আগের মতোই তাকিয়ে রইলেন। তারপর আরো একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি পড়ে যাচ্ছিলাম এটা আপনার চোখে পড়ল, আর এই যে বাসের ভেতর ধরার রড নেই, এগুলো যে খুলে নিয়ে গেছে, এটা আপনার চোখে পড়ল না!'

'আসলে এটা সিটিং বাস তো, সম্ভবত তাই রড রাখা হয়নি।'

মানুষটি আগের চেয়ে রেগে গিয়ে একটু শব্দ করে বললেন, 'আপনি কি এই বাসওয়ালাদের দালাল?'

'আমি দালাল হতে যাব কেন?'

'তাহলে বাসওয়ালাদের পক্ষে কথা বললেন কেন?'

'আমি কই বাসওয়ালাদের পক্ষে কথা বললাম?'

'শুনুন মশাই।' বৃদ্ধ মানুষটি বসে থাকা লোকটির প্রায় নাকের ডগায় একটা আঙ্গুল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা সিটিং বাস আমি জানি, বুড়ো হয়ে গেছি আমি কিন্তু অন্ধ হয়ে যাইনি এখনো। বাস সিটিং হলেই কী বাসের ভেতর রডের দরকার নেই? এই যে এত

প্রতিবাদ

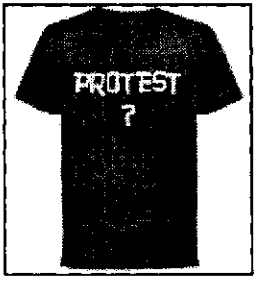

বড় বাস, পেছনের সিটে যারা বসবে তারা সেখানে যাবে কীভাবে? বাস তো বাসস্ট্যান্ডে থামায় না, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে। আপনি এখনো বুড়ো হননি তাই আপনি চলন্ত বাসের পেছনে যেতে পারবেন, কিন্তু আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমরা তো পারি না। শুনুন জনাব, আপনাকে এত কথা বলার কারণ হচ্ছে—আমরা আর এখন মানুষ নেই, আমরা বিড়াল হয়ে গেছি। বিড়াল না, বিড়ালের তাও নখ আছে, আমরা ইঁদুর হয়ে গেছি। আমরা এখন প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি, আমরা ইঁদুরের মতো পালিয়ে বেড়াই, এখানে ওখানে গর্তে লুকিয়ে থাকি, চোখ খুলে তাকাই না, উকি-ঝুঁকি মেরে তাকাই।'

'আপনি ঠিক বলেছেন চাচা?'

পাশ থেকে একটা তরুণ কথাটা বলতেই বৃদ্ধ মানুষটি তার দিকে তাকালেন, 'ঠিক বলেছি মানে কী, একশ পার্সেন্ট ঠিক বলেছি। যত্রতত্রভাবে রাস্তার মাঝখানে বাস দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা প্রতিবাদ করি না; ড্রাইভাররা ইচ্ছে মতো গাড়ি চালায়, আমরা প্রতিবাদ করি না; অফিস-আদালতে যে যেমন পারছে ঘুষ খাচ্ছে, আমরা প্রতিবাদ না করে তা দিয়ে যাচ্ছি; যার যা ইচ্ছে দখল করছে, আমরা সেই দখল করা জায়গায় তাদের উল্লাস দেখছি। যার যা ইচ্ছে তাই করছে, আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছি।'

বৃদ্ধ মানুষটি বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বললেন, 'বাবা রে, একেকদিন মনে হয়, চিৎকার করে আর কিছু হবে না। গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, সবাইকে নিজের উলঙ্গ রূপটা দেখাই। তাতে যদি কারো হুস হয়, একটু করুণা হয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের জন্য।' বৃদ্ধ লোকটি শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সিটে বসে সামনের সিটের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। আমরা যারা ৩০ এপ্রিল, সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে, মতিঝিলগামী বাসে মিরপুর কাজীপাড়ার রাস্তায় ছিলাম, আমরা কোনো কথা বলিনি তখন, কথা বলতে পারিনি আমরা, আমাদের কারো কারো চোখ ভিজে গিয়েছিল নীরবে। সেই চোখের জলে যতটা না দুঃখ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল অক্ষমতা! হায় মানুষ, দূর্বল মানুষ, অক্ষম মানুষ!

খুব নির্দ্বিধায়, খুব নিসঙ্কচিত্তে আমি বলতে চাই, কথাটা আমি বলবই। আপনারা আমাকে যে যাই বলুন না কেন, হৃদয়ের সব কিছু উগরে দিয়ে, প্রাণের সব কিছু নিক্ষেপ করে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কথাটা আমি বলবই, ওই তিনজনকে বলব।

কথাটা শুনে খুব ক্রুদ্ধস্বরে আপনারা আমাকে 'বেয়াদব' বলে গালি দিতে পারেন। জগতের সব বেয়াদবের সেরা বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করতে পারেন, এমনকি আমাকে এই বেয়াদবির জন্য ক্ষমা চাইতে বলতে পারেন। তারপরও আমি বলছি—কথাটা আমি বলবই।

'জানোয়ার' বলে আপনারা আমাকে মানুষ জাতি থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে পারেন। আরো একটু বেশি রেগে গিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জানোয়ারের সঙ্গে আমাকে তুলনা করতে পারেন। যদিও স্রষ্টার সৃষ্টি কোনো নিকৃষ্ট নয়, অন্তত কোনো প্রাণীই নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করে না। কেবল নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবী করা মানুষের প্রতিদিনের অনেক তাকে নিকৃষ্টের দলে ফেলে দেয়! যাই হোক, আপনারা আমাকে জানোয়ার বলুন আর যাই বলুন—কথাটা আমি বলবই।

দুর্নীতি করলে আজকাল কিছুই হয় না, অন্তত এই দেশে হয় না। যদি হতোই তাহলে প্রতি পাঁচ বছর পর পর যারা ক্ষমতায় আসেন নির্দ্বিধায় তারা দুর্নীতি করতে পারতেন না। প্রতি পাঁচ বছর পর পর আমরা কিছু দুর্নীতিবাজ পাই দেশে, আমরা তাদের ঘৃণাও করি। আপনারা আমাকে সেই ঘৃণিত দুর্নীতিবাজ বললেও আমি কোনোরকম লজ্জা না পেয়ে কথাটা বলবই।

কথাটা আমি বলবই

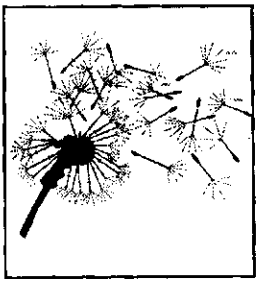

আমাকে যদি আপনারা বলেন—পৃথিবীর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী কে? সেকেন্ডের একশত ভাগের এক ভাগ সময় না নষ্ট করে আমি বলব-যারা ঘুষ খায়, তারা। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই দেখা যায়, কী নির্লজ্জ তারা! কী নির্লজ্জ তাদের চাহনি! কী নির্লজ্জ তাদের আচরণ! আপনারা আমাকে যদি সেই 'ঘুষখোর' বলে গালি দেন, তবুও আমি সেই কথাটা বলব।

কে যেন বলেছিলেন—ক্ষমতাবান হতে গেলে আপনাকে চাঁদাবাজি করতে হবে, ক্ষমতাবান হয়ে যাওয়ার পর টিকে থাকতে হলেও আপনাকে চাঁদাবাজি করতে হবে।

পার্থক্য হচ্ছে এই—ক্ষমতাবান হওয়ার আগে আপনি নিজে চাঁদা চাইবেন, ক্ষমতাবান হওয়ার পর সবাই আপনাকে নিজে এসে চাঁদা দিয়ে যাবে। পার্থক্য টার্থক্য যাই হোক, চাঁদাবাজি তো চাঁদাবাজিই! আপনারা যদি খুব বিরক্ত হয়ে আমাকে চাঁদাবাজ বলেন, কথাটা আমি বলবই, অবশ্যই বলব।

ছিনতাই কতরকম আছে জানেন? ভোটের আগে ভোটপ্রার্থী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন ছিনতাই করেন, ভোটে জেতার পর সেটা তারা ভুলে যান; বাজারে কেমিক্যাল মেশানো রঙিন ফল দেখিয়ে আমাদের হৃদয় ছিনতাই করেন ব্যবসায়ীরা, সেই ফল খেয়ে আমাদের পেটের অসুখ হয়; পণ্যের সাথে এটা-ওটা অফার করে অনেকে আমাদের মনোযোগ ছিনতাই করেন, সেই অফার গ্রহণ করার পর আমরা বুঝতে পারি অফারটা আসলে কিছুই না। আবার হঠাৎ হঠাৎ রাস্তায় কেউ আপন করে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পেটের সঙ্গে একটা কিছু ঠেকিয়ে দেয়, তারপর সবকিছু নিজের মনে করে নিয়ে যায়। আহা কতরকম ছিনতাই! আপনারা যদি ছিনতাইকারী মনে করে মুক্তহস্তে পিটতেও থাকেন আমাকে, তবু আমি কথাটা বলব।

দেশদ্রোহী কাকে বলে? যারা সজ্ঞানে দেশের ক্ষতি করে, দেশের মানুষের ক্ষতি করে, তারাই দেশদ্রোহী। এবার বলুন তো, এই দেশের কারা কারা দেশদ্রোহী? ঠিক ধরেছেন, গুনে শেষ করা যাবে না। আপনারা যদি সেই দেশদ্রোহী বলে আমাকে চিৎকার করে বকতে থাকেন, আমি কথাটা বলবই, সেই চিৎকার করেই বলব।

কত রকমের অপরাধ যে মানুষ প্রতিদিন করছে, তাদের মধ্যে অন্যতম অপরাধ হচ্ছে যুদ্ধাপরাধ। আপনারা কোনো কিছু না ভেবে, যুদ্ধের সময় আদৌ আমার জন্ম হয়েছে কী না সেটা না জেনেই যদি আমাকে যুদ্ধাপরাধী বলেন, আমি তবুও কথাটা বলবই।

অথবা আমাকে দেশের সবচেয়ে ঘৃণিত গালি 'রাজাকার' বলেও ভূষিত (!) করেন আমাকে, কথাটা আমাকে বলতেই হবে, বলতেই হবে।

এত কিছু বলার পরও যদি আপনারা আমাকে বয়কট করেন, আমাকে ত্যাগ করেন, বহিষ্কার করেন, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেন, তবুও আমি বলবই, কথাটা আমি বলবই।

একজন মায়ের এক ছেলে ডাক্তার, একজন আর্কিটেক্ট, এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার—সেই গুণধর (!) তিন ছেলের মা এখন থাকেন আগারগাঁওয়ে বৃদ্ধাশ্রমে। মা দিবসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, তাঁর ছেলেরা তাঁকে এখানে রেখে গেছে। সব শেষে তিনি বললেন, তবু তাঁর ছেলেরা ভালো থাকুক, আল্লাহ তাদের ভালো রাখুক।

মহিলার চিবুক বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে, থর থর করে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর ঘোলাটে চোখ তাকিয়ে আছে ঘরের সিলিংয়ের দিকে। হৃদয় কেঁপে ওঠা, মনুষ্যত্ব পরাজিত হওয়া, মানবতার পতনের এই দৃশ্য দেখে আমি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সেই কথাটা এখন বলব, ওহে মানুষরূপী তিন গুণধর—আপনারা মানুষ নন, অমানুষ!

একটি খবর

পুরুষ বিলুপ্ত হবে, পৃথিবী একদিন হবে শুধু নারীর!

ভাবতে পারেন এমন একটি পৃথিবীর কথা, যেখানে পুরুষের সংখ্যা দিন দিন কমতে কমতে একেবারে 'নাই' হয়ে গেছে। ডানে-বামে চোখ ফেললে দেখা মিলবে শুধু নারীর! এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছেন সেক্স ক্রোমোজম নিয়ে গবেষণা করা বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেনিফার গ্রেভস। তিনি বলেছেন, ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য প্রয়োজন যে 'ওয়াই' ক্রোমোজম, তা দিন দিন মারা যাচ্ছে। এমন সময় আসতে পারে যখন পুরুষের শুক্রাণুতে কেবল থাকবে 'এক্স' ক্রোমোজম। ফলে জন্ম নেবে কেবল কন্যা সন্তান। অল্প যে কয়েকজন পুরুষ জীবিত থাকবেন সময়ের সাথে সাথে তারা গত হলেই দুনিয়া হবে 'নারীময়'।

তারপর?

তারপর যতগুলো সমস্যা হবে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা তখন আর নিচের গল্পগুলোর মতো কোনো গল্প লিখতে পারব না।

অতঃপর যেসব গল্প আর কোনো দিন লেখা হবে না

মিনহাজ সাহেব হাসপাতালের বেডে শুয়ে থেকে কী যেন ভাবছিলেন। তিনি আজ আঠার দিন ধরে এই হাসপাতালে। অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তাঁর, এখন একটু ভাল। একটা দোয়েল পাখি এসে জানালার গ্রিলে এসে দাঁড়াতেই ভাবনাটা ভেঙে গেল তাঁর। একটু পর দোয়েলটি চলে যেতেই তিন আবার ভাবনায় পড়ে গেলেন। এমন সময় দ্রুত পায়ে বাইরে থেকে রুমে ঢুকেই পাশের বিছানায় ধপাস করে বসে পড়লেন তাঁর স্ত্রী। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি পাশ ফিরে দেখেন, তাঁর স্বামী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি স্বামীর গায়ে ছোট্ট একটা গুঁতো দিয়ে বললেন, 'আমি মার্কেট করে এসে ঘরে ঢুকলাম, তোমার তা চোখেই পড়ল না!'

'তোমাকে চোখে পড়তে হয় না, পায়ের শব্দ

শুনলেই বোঝা যায় তুমি এসেছে।' জানালার দিকে তাকিয়েই কথাটা বললেন মিনহাজ সাহেব।

'বসে বসে এত কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি, আমার সকল দুঃসময়ে তুমি আমার পাশে ছিলে।'

'হ্যাঁ, ছিলামই তো।'

'আমার যখন চাকরি চলে গেল, ওই সময়টাতে তুমি আমার পাশে ছিলে।'

'হ্যাঁ, ছিলামই তো।'

'আমি যখন ব্যবসায় প্রচণ্ড মার খেলাম, সে সময়টাতেও তুমি আমার সঙ্গে ছিলে।

'হ্যাঁ ছিলামই তো।'

'তিন বছর আগে শপিং করে ফিরে আসার সময় ছিনতাইকারীরা আমার পেটে যখন ছুরি মারল, তখনও একই রিকশায় তুমি আমার পাশে বসেছিলে।'

'হ্যাঁ, পাশেই তো বসে ছিলাম।'

'সব কিছু শেষ হতে হতে যখন আমার বাড়িটা বিক্রি করতে হল, তখনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাওনি।'

'হ্যাঁ।' মিনহাজ সাহেবের স্ত্রী একটু জোর দিয়ে বলেন, 'তখনো আমি তোমার পাশে ছিলাম।'

'এই যে কয়েকদিন আগে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে আমি হাসপাতালে ভর্তি হলাম, তখনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাওনি।' মিনহাজ সাহেব দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যখন আমি এসব কথা ভাবি, তখন আমার কী মনে হয় জানো?'

মিনহাজ সাহেবের স্ত্রী কিছুটা গদগদ হয়ে বলেন, 'কী?'

'আমার এতসব দুর্ভাগ্য তুমিই টেনে এনেছ!'

গল্প ২

দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে মাঝরাতে বাড়িওয়ালাকে ডেকে এক ভাড়াটে বললেন, 'আপনি কেমন বাড়িওয়ালা বলুন তো! চারতলার বাম পাশের মহিলাটি সেই রাত আটটা থেকে চিৎকার করে সবার ঘুম নষ্ট করছে। আপনার তো একটা দায়িত্ব আছে, সবার মঙ্গলার্থে ওনার চিৎকার তো থামানো দরকার।'

'তা তো দরকারই।' বাড়িওয়ালা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওই মহিলার সামনের ফ্ল্যাটটা কি আপনার ফ্ল্যাট?'

'জ্বি না, আমি ওই মহিলার ফ্ল্যাটেরই গৃহকর্তা!'

মানুষটা আমাকে এভাবে ধাক্কা দেবে আমি তা কল্পনাই করিনি। মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম। ফার্মগেটে গাবতলীর কোরবানির হাটের মতো গিজ গিজ করছে মানুষ। অফিস ছুটি হয়েছে, সবাই যার যার বাসায় ফিরতে চায়, যত দ্রুত সম্ভব ফিরতে চায়।

ধাক্কা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন মানুষটা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'আপনি ভালো আছেন?'

কিছু বললেন না তিনি। কেবল ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টির মাঝে শূন্যতাটা আরো বেড়ে গেল। আমি আবার বললাম, 'আপনি ভালো আছেন?' এবার কিছু বললেন না তিনি। কেবল চামড়ার নিচে কিলবিল করা নীলচে রক্তনালীসমৃদ্ধ একটা হাত তিনি আমার বাম কাঁধে রাখলেন। টের পেলাম, হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

কাঁধে হাত দিয়েই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমিও। একটু পর তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ইয়ং ম্যান, চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো?'

'আছে, তবে সব সময় না, মাঝে মাঝে।'

'তোমাকে তুমি করে বলতে পারি?'

'সিওর।'

'চলো, সামনের কোনো একটা হোটেলে বসি।' মানুষটা অভিভাবকসুলভ আমার একটা হাত ধরে এগিয়ে যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অ স্যরি, তোমার সময় আছে তো?'

জরুরি একটা কাজে তাড়া ছিল আমার। তৎক্ষণাৎ বাতিল করলাম সেটা। অনেকগুলো কারণ আছে। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষটাকে ভালো লেগেছে আমার। বললাম, 'অসুবিধা নেই, সময় হবে আমার।'

আপনি ভালো আছেন তো

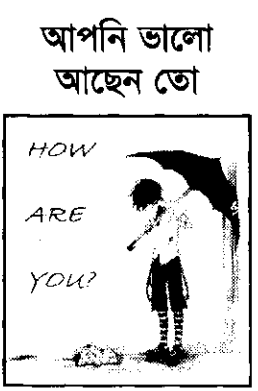

'থ্যাংক ইউ।' মানুষটা আমার হাত ধরে আবার এগুতে লাগলেন। মুগ্ধতার ভাব নিয়ে আমিও এগুতে লাগলাম। ফার্মগেটের অগোছালো পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর তিনি বসতে বসতে বললেন, 'বসো। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করতে আসবে কেউ। আমরা তখন চা খাব।'

একটু পর সত্যি সত্যি চা এল। দ্রুত চা শেষ করে তিনি বললেন, 'একটা কথা বলব তোমাকে। বিশ্বাস করবে কী না জানি না, তবু বলব। তুমি আজ যেরকম আন্তরিকতায় বললে—আপনি ভালো আছেন, গত নয় বছরে কেউ আমাকে এমন মনোমুগ্ধকর আন্তরিকতায় কোনোরকম কুশল জিজ্ঞেস করেনি। তোমার বিশ্বাস হয়?'

কিছু বলি না আমি। তিনি একটু আয়েশ করে বসে বলেন, 'সকাল হলেই আমার মনে হয় আরো একটা যন্ত্রণাময় দিন কাটাতে হবে আমাকে। আমার ছেলে অফিসে যায়, আমার ছেলের বউও অফিসে যায়। দু জনই চাকরি করে তো। বাসায় তখন আমি, ওদের দু বছরের একটা ছেলে আর কাজের মেয়েটা থাকে। এই সময়টা আমার ভালোই কাটে। ঠিক বিকেল হলেই আমি অস্থির হয়ে যাই। তখন আমার ছেলে, ছেলের বউ বাসায় ফিরে আসে। জানো, ওরা সারাদিন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না। অথচ সত্য হচ্ছে, আমি আমার জীবনের সব আয় দিয়ে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি।'

'আপনার স্ত্রী-।'

কথাটা শেষ করার আগেই তিনি বললেন, 'উনি তো মরে গিয়ে বেঁচেছে। কবরে গিয়ে খুব ভালো আছে ও।' মানুষটা একটু থেমে বলেন, 'প্রতিদিন বিকেল হলেই তাই বাসা থেকে বের হয়ে আসি, এখানে এসে বসে থাকি, একা একা চুপ থেকে অনেক কিছু ভাবি। সবচেয়ে বেশি কী ভাবি জানো?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে আমি মানুষটার দিকে তাকাই। চোখ দুটো ছল ছল করে তিনি বলেন, 'পরজনমে মানুষ হয়ে যেন না জন্মাই, পশু হয়ে যেন জন্মাই। বুড়ো বয়সে কোনো ছেলে বা মেয়ের করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে হবে না তখন!'

মানুষটা ঝট করে আকাশের দিকে তাকান। কাকে যেন খুঁজতে থাকেন তিনি আকাশে। সমস্ত আকাশে চোখ বুলিয়ে তিনি খুঁজতেই থাকেন।

চিৎকার করতে করতে গলা ফেটে গেছে আমাদের। পরিবেশ দিবসে আমরা মিছিল করছি—পরিবেশ বাঁচান, দেশ বাঁচান। কোনো এক এনজিও থেকে পাওয়া সাদা গেঞ্জি পরেছি আমরা, গেঞ্জির সামনে চকচকে একটা শ্লোগান লেখা, পেছনে আরেকটা শ্লোগান লেখা। অনেক লোক হয়েছে মিছিলে। পরিবেশ বাঁচাতেই হবে। নইলে...।

মিছিল শেষ। এখন আপ্যায়ন পর্ব। প্যাকেট খাবার চলে এসেছে। সবার হাতে পৌঁছে যাচ্ছে প্যাকেটগুলো। সবাই গোগ্রাসে গিলছি আমরা। খাবার খাওয়া শেষ। প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আশপাশে। কুকুর, বিড়াল, কাক এবং অর্ধ-মানব টোকাইরা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে প্যাকেটে লেগে থাকা উচ্ছিষ্ট খাবারগুলোর জন্য। আমরা ছড়িয়ে থাকা প্যাকেটগুলো পাশ কেটে আবার জড়ো হলাম। ছবি তোলা হবে, পত্রিকায় ছাপা হবে। সবাই উদীপ্ত হয়ে ছবি তুললাম, হাত উঁচু করে ছবি তুললাম—পরিবেশ বাঁচাতেই হবে। নইলে...।

সবশেষে আমরা চলে এলাম, পেছনে পড়ে রইল খাবারের শত শত প্যাকেট আর আমাদের শ্লোগানের বাণী—পরিবেশ বাঁচান, দেশ বাঁচান।

২

ব্যাপারটাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেছি আমরা, বলা চলে একশ পার্শেন্ট উদ্বুদ্ধ। সারাদেশে এখন একটাই শব্দ—গাছ লাগান, মানুষ বাঁচান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও গাছ লাগাতে বলেছেন। সুতরাং গাছ আমাদের লাগাতেই হবে।

ছোটকালে দেখেছি বাবা অনেক গাছ লাগাতেন। তার মধ্যে লাল টকটকে সিঁদুরে একটা আমগাছ ছিল আমাদের। আমগুলো এত মিষ্টি ছিল, ছোটও ছিল। দুটো আম এক সঙ্গে মুখে পুরে দেওয়া যেত। কী যে

অন্ধজন

স্বাদ ছিল আমগুলোর। কালচে ধরনের একটা কাঁঠাল গাছে এত কাঁঠাল ধরত যে সারা গ্রামের মানুষ খেয়েও শেষ করতে পারত না। একটা বড় নিম গাছও ছিল আমাদের, সেই গাছে কত রকমের পাখি যে বাসা বাঁধত। সবচেয়ে বেশি বাসা বাঁধত বক, সাদা আর মেটে রঙের বক।

বৃক্ষমেলা থেকে অনেকগুলো গাছ কিনেছি এবং সেগুলো বাসায়ও নিয়ে এসেছি। সেই সিঁদুরে আম গাছ, কালচে কাঁঠাল গাছ, হরেকরকম পাখির আশ্রয় নিম গাছসহ। আমাদের বাড়ির প্রায় সব গাছে কেটে আমরা ছয়তলা যে বিল্ডিংটা বানিয়েছি, সেই বিল্ডিংয়ের ছাদে বৃক্ষমেলা থেকে কেনা গাছগুলো লাগাব। অনেকগুলো টব আছে সেখানে, সেগুলোতে লাগাব। কারণ, গাছ লাগাতে হবে, মানুষ বাঁচাতে হবে।

৩

দখল হয়ে যাচ্ছে দেশের সব নদী। নদী বাঁচাতে হবে। কারণ, নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। সুতরাং আন্দোলন করতে হবে, মিছিল করতে হবে, সভা করতে হবে, সেমিনার করতে হবে। সব আমরা করলামও। একটা নদীর পাড়ে এসে আমরা শপথও করলাম-নদী রক্ষা করবই। হঠাৎ উচ্চপদস্থ একজন ঘোষণা দিলেন—নদীর পাড়ের সব অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলতে হবে এবং সেটা কাল থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতর চিউ করে উঠল আমার। প্রতিবার এরকম মিছিল তো কতই করি, কিন্তু কখনো তো নদীর পাড় মুক্ত করা হয়নি। এবার হবে! আমারও তো একটা স্থাপনা আছে নদীর পাড়েই!

পেটের ভেতর চাপ বাড়ছে, তলপেটটাও ভারী হয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে বসে নদীর পানিতে সেই চাপ আর ভার ছলছল শব্দে মুক্ত করে বেশ দূরে এগিয়ে যাওয়া মিছিলের দিকে দৌড়াতে লাগলাম—নদী বাঁচাতে, দেশ বাঁচাতে হবে। অবশ্যই অবশ্যই...।

আমি এবং আমরা পরিবেশ বাঁচানোর চেষ্টা করলাম, গাছ লাগালাম, নদী রক্ষার জন্য মিটিং-মিছিল করলাম। এসব বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। অথচ কয়েকদিন আগে রংপুরের এক গ্রামে একটা মেয়ে তথা একটা মানুষ ধর্ষিত হয়েছে এবং বিচারে তাকেই একশটা বেত মারা হয়েছে। পরিবেশ, গাছ, নদী রক্ষাকারী সবাই আমরা এটা জানি। কিন্তু ওই মেয়েটির জন্য কিছুই করিনি আমরা। সবই বাঁচল, কিন্তু মানুষ বাঁচল না, তাহলে? মেয়েটির কথা শুনে আমরা সবাই চুপ হয়ে থেকেছি, অবিকল বোবা প্রাণীর মতো চুপ হয়ে থেকেছি।

গল্প ১

বড্ড মন খারাপ করে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। খেতে ভালো লাগে না, ঘুমাতে ভালো লাগে না, টিভি দেখতে ভালো লাগে না, এমন কি ঘরের কোণায় রাখা ক্রিকেট ব্যাট আর বলটাও দেখতে ভালো লাগে না তার। সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা হচ্ছে—তিনি যে বেশ কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছেন, ঘরের শোকেসে রাখা সেই পুরস্কারগুলোর দিকে তাকাতেই হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠছেন তিনি। তার মনে হচ্ছে পুরস্কারগুলো তাকে দেখে হাসছে, কুট কুট করে হাসছে, কোনো কোনোটা আবার মুচকি হাসছে। তাই দেখে আশরাফুলের মনে হচ্ছে—পুরস্কারগুলো তাকে ভেঙ্গাচ্ছে, অপমানজনকভাবে ভেঙ্গাচ্ছে। মাথা গরম হয়ে গেল তার। মাঝরাতে উঠে তিনি বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢেলেছেন তিন বালতি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আশরাফুলের বান্ধবী বললেন, 'তোমার তো মন খারাপ, চলো শপিংয়ে যাই, মন ভালো হয়ে যাবে তোমার।'

'শপিংয়ে যাবো! আমার ওপর তো সবাই খেপে আছে।'

'খেপে আছে তাই কী হয়েছে। তোমাকে দেখলে কেউ মারবে নাকি?'

'মারতেও তো পারে।'

'দূর, তুমি যে কী বলো না। চলো তো।'

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বান্ধবীকে নিয়ে শপিংয়ে গেলেন আশরাফুল। কিন্তু রাস্তায় বের হতেই তার মনে হলো-সারা শহরের মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে, ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। তারাও পুরস্কারগুলোর মতো কুট কুট করে হাসছে।

মাথা নিচু করে ফেললেন আশরাফুল। ঠিক তখনই শুনতে পেলেন—ভূয়া ভূয়া, ওই যায় যে ভূয়া...।

কালো টাকা সাদা করা যাবে, কিন্তু কালো মানুষ?

অপমানে চেহারা নীল হয়ে গেল আশরাফুলের। তাই গাড়ির পাশে বসা বান্ধবীটি বললেন, 'কই, সবাই তো তোমার দিকে তাকিয়ে নেই, কেউ তো কোনো কিছু বলছেও না। তুমি তাহলে চেহারাটা অমন করে রেখেছ কেন?'

'তুমি ঠিক বলছ তো?'

'ঠিক বলছি না মানে!'

'সবাই যেন ফিসফিস করে কী বলছে!'

'কই সবাই ফিসফিস করে বলছে?'

'বলছে না?'

বান্ধবীটি একটু জোর দিয়ে বললেন, 'না বলছে না।'

বড়-সড় একটা শপিংমলে ঢুকে আশরাফুল বললেন, 'আমার কিছু কিনতে ইচ্ছে করছে না, তুমি তোমার পছন্দ মতো একটা কিছু কেন?'

আশরাফুলকে কোনোভাবেই রাজী করাতে না পেরে বান্ধবীটি একটা দোকান থেকে এক সেট ড্রেস কিনলেন। দোকানদার ড্রেসটা প্যাকেট করে দেওয়ার পর সঙ্গে আরো একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন তাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আশরাফুল বললেন, 'এটা কীসের প্যাকেট?'

দোকানদার খুব নিস্পৃহভাবে বললেন, 'বোরকার।'

'বোরকা! বোরকা কার জন্য?'

'আপনার জন্য। এটা এখন আপনার জন্য খুবই জরুরি।' দোকানদার দাঁত চিবাতে চিবাতে বললেন, 'বলা তো যায় না কখন কী হয়ে যায়!'

গল্প ২

খুব অবাক হয়ে কর অফিসের সবাই সামনের দিকে তাকালেন। তিনজন শক্ত-সামর্থ মানুষকে দড়ি দিয়ে বেধে এনেছেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। তারপর সবার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'এ তিনজন আমার ছেলে, কুলাঙ্গার ছেলে। এদের একজন ঘুষ খায়, একজন কর ফাঁকি দেয়, আরেকজন ভেজাল জিনিস বিক্রি করে কোটিপতি হয়েছে। আপনারা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছেন, এই যে এরা, এরা কালো মানুষ, এদের জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছেন? কালো টাকা সাদা করা যায়, কিন্তু কালো মানুষ?'

বৃদ্ধটি একটু চুপ থেকে বলেন, 'আমাদের দেশটা কালো মানুষে ভরে গেছে। যতদিন না এটা বন্ধ হবে, ততদিন কালো টাকা বাড়তেই থাকবে।' বৃদ্ধটি তার তিন ছেলেকে রেখে আস্তে আস্তে বের হয়ে গেলেন অফিস রুম থেকে।

বাচ্চাটা দ্রুত দৌড়াচ্ছে, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ছোট ছোট পায়ে সে যতটুকু পারছে ততটুকু দৌড়াচ্ছে। তার ছোট্ট বুকটা ফেটে যেতে চাচ্ছে, তার ভেতরের ছোট্ট কলিজাটা উদভ্রান্তের মতো লাফাচ্ছে, মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছে, নিশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে, চোখের মণি দুটো বের হয়ে যেতে চাচ্ছে, তবু সে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে তাকে হবেই। কারণ তার পেছনে একজন দৌড়ে আসছে, তার চেয়েও দ্রুত পায়ে, দ্রুত গতিতে দৌড়ে আসছে।

বাঁকা রাস্তাটার বাঁক পেরোতে নিতেই কীসের সঙ্গে যেন বাঁধা পায় সে, একটু খানি হোঁচট খায়, উল্টে যেতে যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়ায় আবার। একটুকুও থামা নয়, আবার দৌড়াতে থাকে সে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে দৌড়াতে থাকে।

পেছনের জন আসছে, একটু একটু করে কাছে এসে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে সে। কিন্তু না, তাকে কাছে আসতে দেওয়া যাবে না, কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না। তার আগেই পালাতে হবে, কোনো একটা আড়ালে লুকিয়ে পরতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।

সামনের রাস্তায় একটা গাছ পড়ে আছে। এক পলক দেখে নেয় সে। গাছের নিচে সামান্য ফাঁক আছে। উপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাবে, না কুঁজো হয়ে ওই ফাঁক দিয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই কুঁজো হয়ে পড়ে সে, গাছের সেই সামান্য ফাঁক দিয়ে পেরিয়ে যায়। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ধপাস করে একটা শব্দ হয়। পেছনের জন গাছের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়েছে। এগিয়ে আসছে।

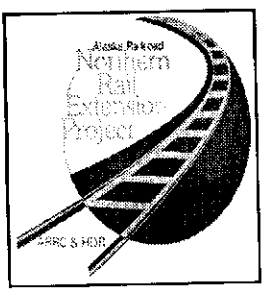

আশেপাশে অনেক জন দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ তাকিয়ে আছে, কেউ কেউ নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে, কেউ এক পলক তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে- না, কারো কোনো আগ্রহ নেই, সে যে জীবন বাঁচানোর তাগিদে দৌড়াচ্ছে সেটা নিয়েও কোনো মাথা ব্যথা নেই কারো। স্বার্থপরের মতো সবাই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত, যার যার কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ মায়ের কথা মনে হলো তার। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চোখের কোণা দুটোও ভিজে উঠল শিরশির করে। হায়, মায়ের সঙ্গে কী আর কোনো দিন দেখা হবে না তার, মায়ের আদরের স্বাদ পাবে না কোনোদিন, মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারবে না আর কখনো! হাহাকার করে ওঠে সে দৌড়াতে দৌড়াতেই, বেদনায় কাতরাতে থাকে নীরব শব্দেই।

পেছনের জন আরো কাছে এসে গেছে। তার পায়ের শব্দটা আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ধুলো উড়ছে, নাকে এসে লাগছে সেই ধুলোর গন্ধ।

দ্বিতীয় বাঁকটা পেরোতে নিতেই সে পুরোপুরি উল্টে যায়। দু তিন পাক গড়ানিও দেয়। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে তার, পেছনের জন কাছে এসে গেছে। প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে কোনো রকমে সোজা দৌড়াতে থাকে আবার, কয়েক পা এগিয়েও যায়, আরো একটু এগুলেই ঘন একটা জঙ্গল, তারপর সেখানে টুক করে ঢুকে পড়া, আপাত নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু না, তার আগেই নখওয়ালা একটা থাবা এসে আঁচড় কাটে তাকে, উল্টে পড়ে যায় সে, সঙ্গে সঙ্গে খপ করে ধরে ফেলে তাকে পেছনের জন।

মেরে না ফেলে হরিণের ছোট্ট বাচ্চাটিকে নিজের ছোট তিনটে বাচ্চার মাঝে এনে ছেড়ে দেয় চিতাবাঘটি। চিতার ছোট্ট বাচ্চা তিনটি হরিণের ছোট্ট বাচ্চাটিকে নিয়ে খেলতে থাকে, আনন্দ নিয়ে খেলতে থাকে, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মা চিতাটি তাকে মেরে টুকরো টুকরো করে বাচ্চাগুলোর মুখে তুলে দেয়, আনন্দে চোখ বুজে বাচ্চাগুলো চাটতে থাকে মাংসগুলো।

অ্যানিম্যাল প্লানেট টিভি চ্যানেলে এই দৃশ্যটা দেখে বাইশ ঊর্ধ্ব এক গৃহবধূ ডুকরে কেঁদে ওঠে, চিতাবাঘটিকে তার নিষ্ঠুর মনে হয়, নিজের বাচ্চার জন্য অন্যের বাচ্চাকে মেরে ফেলা তার কাছে নির্মম মনে হয়। তিনি এবার শব্দ করে কেঁদে ওঠেন।

বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফিরতেই বাইশ ঊর্ধ্ব সেই গৃহবধূটি তার স্বামীকে বলেন, 'যাক, আজ কবুতরের বাচ্চা নিয়ে এসেছ তুমি। আমাদের ছোট পিচ্চিটা কবুতরের বাচ্চার স্যুপ ছাড়া আরো কোনো কিছু খেতেই চায় না। কী যে মুশকিল না।' কথাটা শেষ করেই তিনি স্বামীর হাত থেকে কবুতরের বাচ্চা দুটি নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে যান। ছোট্ট বুকের ছোট্ট ছোট্ট কাঁপুনিতে বাচ্চা দুটি থির থির করতে থাকে, ছোট্ট ডানায় ছোট্ট ছোট্ট ঝাঁপটানি দিতে থাকে তারা আর ছোট্ট ছোট্ট চোখের ছোট্ট ছোট্ট মণিতে রাজ্যের ভয় এসে ঠাঁই নিয়েছে।

গৃহবধূটি এসবের কিছুই দেখেন না, তাই তিনি আর ডুকরে কেঁদে ওঠেন না, কোনো কিছু নির্মমও মনে হয় না তার। তিনি ব্যস্ত। তিনি তার ছোট্ট বাচ্চার জন্য ছোট্ট কবুতরের বাচ্চার স্যুপ তৈরিতে ব্যস্ত!

বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। আমরা এই দেশের সাধারণ মানুষেরা, যাদেরকে বলা হয় আমজনতা, সেই আমরা আরো একটা বিষয়ে দুঃখ পেয়েছি। দুঃখের কারণটা হলো—আমাদের প্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা দেশে চিকিৎকসা করাতে পারলাম না। চিকিৎসার জন্য তিনি গিয়েছেন সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি চিকিৎসা করাবেন, সেই চিকিৎসা করানোর আস্থা রাখার মতো কোনো হাসপাতাল বাংলাদেশে নেই! এটা হচ্ছে নতুন সপ্তাশ্চর্যের পর অষ্টম নম্বর আশ্চর্য! আমরা লজ্জা পাচ্ছি।

মানুষ পালাচ্ছে! মনে হতে পারে এলাকায় কোনো বাঘ ঢুকেছে কিংবা কোনো জীবননাশী রোগ ঢুকেছে। আবার এও মনে হতে পারে বন্যার পানি এসে সব কিছু ডুবিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু খুব সত্য কথা হচ্ছে-মানুষ পালাচ্ছে মানুষের ভয়ে। আইলাদুর্গত শরণখোলায় কর্মরত প্রায় সকল এনজিও সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে দুর্গত মানুষের নিকট হতে ঋণের কিস্তি আদায় করছে। এনজিও কর্মীদের অব্যাহত চাপের মুখে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে কেউ কেউ ঋণ পরিশোধ করছে। কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষকে সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানই মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্বে আর কোথাও এরকম আছে কি না জানা নেই, এটা হচ্ছে সপ্তাশ্চর্যের পর আরেক অষ্টম আশ্চর্য! আমরা লজ্জা পাচ্ছি।

আমরা লজ্জা পাচ্ছি

মেয়েটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে নির্মমভাবে পিটিয়ে। তারপর হত্যাকে ধামাচাপা দিতে তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন বিষ ঢেলে

দিয়েছে তার মুখে। কারণ মাত্র আট হাজার টাকা! মাত্র আট হাজার টাকা যৌতুকের জন্য নীলফামারী জেলার ঢাকাইয়াপাড়া গ্রামের গৃহবধূ রাবেয়া বেগমকে এভাবে মেরে ফেলে হাসপাতালে রেখে গা-ঢাকা দিয়েছে সবাই। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিদিন কত চিৎকার করি। তবু প্রতিদিন এসিড মারা হয়, ধর্ষণ করা পর বিচারে ধর্ষিতাকেই প্রকাশ্য বেত মারা হয়, একঘরে করে রাখা কোনো নির্যাতিতাকে! এখনো! বিংশ্ব শতাব্দীর এই উৎকর্ষের সময়ও! আশ্চর্য, সপ্তাশ্চর্য, না এটা অষ্টম আশ্চর্য। আমরা লজ্জা পাচ্ছি, খুব।

বর্ষা এলেই প্রতিবছর সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীতে ভাঙন শুরু হয়। সিরাজগঞ্জের মানুষগুলো উৎকণ্ঠায় ভোগে—এই বুঝি সব ভেসে গেল, স-ব ভেঙে গেল। আর ঠিক সেই সময়টাতে সিমেন্ট দিয়ে বানানো এক ধরনের বোল্ডার ফেলানো হয় নদীর পাড় ঘেঁষে। গত ত্রিশ বছরে খাতা-কলমে যতগুলো বোল্ডার ফেলা হয়েছে, অনেকে বলেন, তাতে পুরো যমুনা নদী ভরে যাওয়ার কথা। অনেকে আরো বলেন, বোল্ডার বানানোর যে খরচ দেখানো হয়েছে, তাতে যে পরিমাণ কাগজের টাকা হবে, তার সবগুলো বান্ডিল বেধে ফেললেও নাকি স্থায়ী একটা বাঁধ নির্মাণ হয়ে যেত সিরাজগঞ্জে। অথচ এবারও বন্যা শুরু হয়েছে, এবারও ভাঙন শুরু হয়েছে। দেশে এত মানুষ, এত সুধীজন, কিন্তু এসব দেখছেন না, তারা জেনেও কিছু বলছেন না। কেন? প্রতিবছর বন্যা হয়, প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, কিন্তু নদী ভেঙেই যায়, মানুষ ভেসেই যায়। এটা একটা অষ্টম আশ্চর্য! সভ্য মানুষ দাবী করা এই—আমরা লজ্জা পাচ্ছি, বুকভরা লজ্জা পাচ্ছি।

প্রতিদিন পৃথিবীতে অনেক অন্যায় হচ্ছে। ফাইল আটকিয়ে ঘুষ খাওয়া হচ্ছে, মানুষ মেরে ফেলা হচ্ছে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে, সুন্দর পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে, পৃথিবীকে আস্তে আস্তে নষ্ট করা হচ্ছে।

পৃথিবীতে আজ অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। কেউ গলায় দড়ি দিচ্ছে, কেউ বিষ খেয়ে মারা যাচ্ছে, কেউ নতুন কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করছে। লজ্জায়? ঘৃণায়? হতাশায়? হায়, আমরা তবুও বেঁচে আছি। এই বেঁচে থাকাটাই এখন আশ্চর্যের, পৃথিবীর সবচেয়ে অলৌকিক আশ্চর্যের! এই বেঁচে থাকতে গিয়েই আমরা এখন লজ্জা পাচ্ছি, ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি।

একটি খবর : যেসব দেশের মানুষেরা প্রতিদিন চিজ মাখানো দামী দামী বার্গার খায়, পানির বদলে দামী রঙিন পানি পান করে, রাস্তা-ঘাট যাদের আয়নার চেয়ে চকচকে, গরমে যাদের ঘর ঠাণ্ডা আর শীতে গরম থাকে, সেইসব দেশের মানুষদের চেয়ে আমাদের বাংলাদেশের মানুষরা বেশি সুখী! বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের একটি সংস্থা গবেষণা করে 'হ্যাপি প্লানেট ইনডেক্স ২.০' তালিকার ১৪৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩১তম।

হাসছেন? দয়া করে হাসবেন না। কারণ, সত্যি আমরা সুখী।

সুখী হওয়ার গল্প-১

বাসা থেকে বের হয়েছেন তিনি সকাল সাড়ে সাতটায়। নয়টার মধ্যে তাঁকে পৌঁছুতে হবে, না হলে বড় ধরনের একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাসস্ট্যান্ডে আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি যখন বাসে উঠলেন, ততক্ষণে ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছেন। তারপরও স্রষ্টাকে একটা ধন্যবাদ দিলেন—যাক, অবশেষে একটা বাসে উঠতে পেরেছেন তিনি, একটা সিটও পেয়েছেন পেছনের দিকে।

গন্তব্যে পৌঁছার অর্ধেক রাস্তা আসতেই এক ঘণ্টা চলে গেল তাঁর। কপাল কুঁচকে তিনি আশপাশে তাকালেন, চারিদিকে গাড়ি আর গাড়ি। তাঁর মনে হলো আজ সারাদিনেও তিনি কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছুতে পারবেন না। অথচ পৌঁছানোটা জরুরি, খুবই জরুরি।

দয়া করে হাসবেন না!

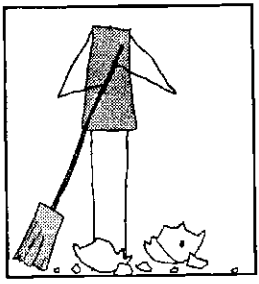

টিকটিক করে সময় চলে যাচ্ছে, শরীরও গরম হয়ে যাচ্ছে তাঁর। একটু পর তিনি নাক ডাকা শুরু করলেন। পাশের সবাই পাশ ফিরে দেখলেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন পেছনে বসা লোকটি।

অভিজাত এলাকার মানুষজন গরমে ঘর ঠাণ্ডা করে, দু তিনটা ওষুধ খায়, সফেদ সাদা ধবধবে তাদের বিছানার চাদর-তবুও ঘুম আসে না তাদের, ছটফট করে কেটে যায় সারা রাত। অথচ এই গা চিটচিটে গরমে,

ভ্যাপসা গরম বাসের ভেতর, ছোট্ট একটা খটখটে সিটে বসে একটা লোক দিব্যি ঘুমাচ্ছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে! এর চেয়ে সুখী আর কে আছে?

সুখী হওয়ার গল্প-২

আট ত্রিশ বছর ধরে এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছেন তিনি। হেঁটে নৌকা ঘাটে আসতে হয়, নৌকা পার হতে হয়, আবার হাঁটতে হয়। ভালোই লাগে তার। হাসি হাসি মুখ করে প্রতিদিন—এভাবেই প্রতিদিন।

যেখানটায় নদী পার হন তিনি, সেই নদীর ওপর সতের বছর আগে ব্রিজের দুটো পিলার তৈরি হয়েছে। ওটাই শেষ, তার পর আর কিছুই এগোয়নি। ভালোই লাগে তার। আগের মতোই হাসি হাসি মুখ করে তার, প্রতিদিন, নিত্য দিন।

যে সয়ে যায়, সেই সুখী। কোথায় যেন পড়েছিলেন তিনি। কথাটা গেঁথেও নিয়েছিলেন মনে-প্রাণে। তিনি আজ সতের বছর ধরে ব্রিজের পিলার দুটো সয়ে যাচ্ছেন, এখনো হাসি হাসি মুখ তার, এখনো তিনি সুখী।

সুখী হওয়ার গল্প-৩

ঘুমানোর জন্য তিনি যখন বিছানায় যান, তখন বিদ্যুৎ ছিল না। মাঝরাতে মশার কামড়ে যখন তাঁর ঘুম ভাঙে বিদ্যুৎ ছিল না তখনো। আলতো করে বিছানা থেকে নেমে তিনি জানালার পাশে গিয়ে দাড়ান। পূর্ণাঙ্গ একটা চাঁদ ভেসে আছে আকাশে। কিছুক্ষণ আগের খারাপ হয়ে যাওয়া মনটা ভালো হতে থাকে তাঁর। সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে পূর্ণিমার আলোতে। কী দরকার কৃত্রিম বিদ্যুৎ আলো! তিনি শব্দ করে গেয়ে ওঠেন—আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...।

আবেশে আবার চোখ দুটো বুজে আসে তাঁর। সুখী মানুষের মতো আবার তিনি বিছানায় যান, ঘুমিয়ে পড়েন সুখী মানুষের মতোই।

আরো সুখী হওয়ার গল্প

লোকটাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর এলাকায় দেখা যায়, সে কেবল ভোটের আগে। ভোট শেষ হয়ে গেলেই তিনি লাপাত্তা। ভোটের আগে তিনি সবার বাড়িতে বাড়িতে যেতেন, ভোটে জেতার পর কেউ তার বাড়ির ছায়াও মাড়াতে পারে না। এত কিছুর পরও আবার ভোট এলে সবাই তাকে ভোট দেয়, সুখী মানুষের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়।

তারপর?

দেশে আজ কম করে হলেও একশ জন মানুষ মারা গেছে। কিন্তু আমি বেঁচে আছি, এই যে আপনি বেঁচে আছেন। এর চেয়ে সুখ কী আছে বলুন, আমাদের চেয়ে সুখী কে আছে বলুন।

একটি খবর : ড্রামের ভেতর গলা ডুবিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন ভারতের মুম্বাইয়ের হিন্দু পুরোহিতেরা। মুম্বাইয়ে ১৫ শতাংশ পানি সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ। বৃষ্টি না হলে আগামী ১ অক্টোবর থেকে পানি সরবরাহ ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। তাই বৃষ্টির জন্য তাঁদের এই প্রার্থনা।

বৃষ্টি, তোমার জন্য

১

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় মানুষের চিৎকারে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি না—কীসের চিৎকার। জানালা খুলে তাকিয়ে দেখি বাইরে ঝুম বৃষ্টি। কোথাও কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না, চারদিকে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দের ফাঁক গলে মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কিছুই। ঘুমিয়ে পড়ি আবার।

সকালে ঘুম ভাঙ্গে সেই মানুষের চিৎকারেই। পাশের বাসার খালি গ্যারেজে একটা মহিলা এসেছেন, সঙ্গে তিন দিনের একটা বাচ্চা। কারণ তারা যে বস্তিতে থাকতেন বৃষ্টিতে সেই বস্তি ডুবে গেছে। আশপাশের প্রায় সব মহিলা দেখতে এসেছেন বাচ্চাটাকে, আফসোস করছেন তারা বিভিন্ন ভঙ্গিতে।

২

বৃষ্টিতে ডুবে গেছে ঢাকা শহর। বাসের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলেছে শহরে। অনেকে আনন্দ করে মাছ ধরেছে। সবচেয়ে বড় মাছটি ধরেছে শ্যাওড়াপাড়ার যুবক ইয়াসীন। ঢাকার ড্রেনে বেড়ে ওঠা চার কেজি ওজনের একটা মাগুর মাছ ধরেছে সে। আনন্দে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছিল, বৃষ্টির পানিতে লাফাচ্ছিল সে ইচ্ছে মতো।

৩

বৃষ্টি ডুবিয়ে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনের রাস্তাটাও। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকল্প রাস্তা দিয়ে অফিসে এসেছেন।

৪

বৃষ্টির তোড়ে ভেঙ্গে গেছে যমুনা নদী এলাকার অনেক রাস্তা। ডুবে গেছে অনেক নিচু এলাকা। তাঁরা তাই ঠাঁই নিয়েছেন বাঁধের ওপর, কাটাচ্ছেন মানবেতর জীবন।

ভারতে যখন বৃষ্টির জন্য হাহাকার বাংলাদেশ তখন বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। প্রতিদিন কিছু না কিছু বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কয়দিন আগেও তো তেমন বৃষ্টি ছিল না, বৃষ্টির জন্য হাহাকার করত সবাই। কেন বৃষ্টি হতো না, কেনইবা এখন বৃষ্টি হচ্ছে? আসুন, ছোট্ট একটা সাক্ষাৎকার পড়ি—

বাউণ্ডুলে : হ্যালো বৃষ্টি, কয়দিন আগেও আপনি আসতে চাচ্ছিলেন না...

বৃষ্টি : কেন আসব?

বাউণ্ডুলে : কেন আসবেন না?

বৃষ্টি : আপনারা যেভাবে নদী-নালা-খাল-পুকুর দখল করে, সেগুলো বোঝাই করে ঘর-বাড়ি তুলেছেন, আমরা আপনাদের এখানে এসে কোথাও আশ্রয় নেব সেই জায়গা কি রেখেছেন?

বাউণ্ডুলে : কেন, আরো খাল বিল আছে না?

বৃষ্টি : সেগুলোও তো আস্তে আস্তে বোঝাই করে ফেলছেন।

বাউণ্ডুলে : কিন্তু হঠাৎ করে যে আবার আসতে শুরু করেছেন?'

বৃষ্টি : মানুষ আমাদের কথা ভুলে যেতে বসেছে, আমরা যে আছি সেটা জানান দিতেই আমাদের এই আসা।

বাউণ্ডুলে : তাই বলে এত ঘন ঘন!

বৃষ্টি : ঘন ঘনর কী দেখেছেন, আগামীতে আমরা এমনভাবে আসছি, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাব—মানুষের অন্যায়, লোভ, লালসা, সব, স-ব। তখন পালানোর সুযোগ পাবেন না!

ফর্সার একটা সীমা পরিসীমা আছে, বাসার ভাই তাঁর চেয়েও ফর্সা। শীত-অশীত নেই, সব ঋতুতেই তিনি এ পরিমাণ পাউডার ব্যবহার করেন, ও রকম ফর্সা শরীরেও সেটা লজ্জাজনকভাবে ভেসে থাকে। মনে হয় তিনি আসলে পাউডার মাখেননি, পাউডারের মডেল হয়েছেন। তাঁর থুতনির নিচ থেকে গলা পর্যন্ত সরকারি অফিসের ফাইলের ওপর পড়ে থাকা ধুলোর মতো একেবারে মাখামাখি হয়ে থাকে পাউডার। শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায় যদিও আমরা ওইটুকুই দেখতে পাই, ভেতরেরটুকু তিনি জানেন আর স্রষ্টা জানেন। এই আবুল বাসার হচ্ছেন আমাদের বাসাওয়ালা। আমরা ডাকি বাসার ভাই।

বাসার ভাই একটা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝারি ধরনের কর্মকর্তা। তিনি যখন অফিসে যান তখন বাসায় থাকেন তাঁর স্ত্রী এবং একটা কাজের মেয়ে। তাঁর কোনো ছেলে নেই, দুটো মেয়ে ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে তাদের।

বাসাওয়ালা বাসার ভাই একদিন অফিসে গিয়েছেন। সেদিন দুপুর বেলা, ঠিক দুপুর বেলা না, দুপুরের একটু আগে তিনজন লোক এসে উপস্থিত তাঁর বাসায়। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। তিনজনের মধ্যে যিনি একটু মোটা ধরনের তিনি বললেন, 'বাসায় আর কেউ নেই?'

কাজের মেয়ে বলল, 'খালাম্মায় আছে।'

'ওনাকে ডাকো।'

বাসায় যেহেতু তেমন কাজ থাকে না, সেহেতু বাসার ভাইয়ের স্ত্রী দুপুরের আগ পর্যন্ত ঘুমান। সেদিনও তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে ডাকা হলো। তিনি দরজার কাছে এসে লোক তিনজনকে দেখে একটু ভড়কে গেলেন। সেটা টের পেয়ে ওই তিনজনের মধ্যে যিনি তুলনামূলকভাবে লম্বা তিনি বললেন, 'আমরা আপনার বাসার গ্যাসের পাইপ পরীক্ষা করতে এসেছি।'

তিনজনের মধ্যে যাকে বেঁটে দেখায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'অলরেডি আমরা পরীক্ষা করেও ফেলেছি। এবং আপনি অন্যায়ভাবে পোনে এক ইঞ্চি পাইপের পরিবর্তে এক ইঞ্চি পাইপ ব্যবহার করেছেন।' মোটা মতো লোকটা গলার স্বরটা গম্ভীর করে বললেন, 'এতে আপনার বাসায়

সোয়াইন ফ্লু আসার পর

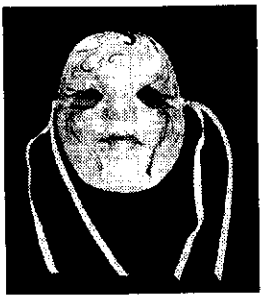

বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনাকে এজন্য বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হচ্ছে, না হলে দু বছরের জেল।'

বাসার ভাইয়ের স্ত্রী লোক তিনজনকে দরজায় অপেক্ষায় রেখে স্বামীকে ফোন করলেন। স্বামী ভীত গলায় বললেন, 'জলদি দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা দফা রফা করো।'

বাসার সব নগদ ধন একত্রিত করে বাসার ভাইয়ের স্ত্রী সাড়ে ছয় হাজার এনে লোক তিনজনকে দিতেই বেঁটে মতো লোকটা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, বাসায় আর নেই, এই টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি, আগামীকাল বাকী টাকাগুলো যোগাড় করে রাখবেন। না হলে কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাবে আপনাদের।'

সাড়ে তিন মাস আগে লোক তিনজন সেই যে গিয়েছেন, বাকী টাকার জন্য তাঁরা আর আসেননি। পাঠক, ঘটনা বুঝে নিন।

সোয়াইন ফ্লু আসার পর

বাসার ভাই আরেকদিন অফিসে গিয়েছেন। সেদিনও দুপুরের একটু আগে কাজের মেয়ে বাসার ভাইয়ের স্ত্রীকে ডেকে তুলল। ভাবী দরজার কাছে এসে দেখেন দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে। কিন্তু তাদের তিনজনেরই নাক আর মুখ ফিতাওয়ালা এক ধরনের কাপড় দিয়ে বাধা। ভাবী কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মহিলা বললেন, 'আমরা একটা এনজিও থেকে এসেছি। মানুষদের সচেতন করাই আমাদের কাজ। আপনি নিশ্চয় সোয়াইন ফ্লুর নাম শুনেছেন?'

ভাবী অস্ফুট স্বরে বললেন, 'জ্বি।'

'এটা একটা মারাত্মক রোগ। আপনাদের বাসায় কে কে আছেন?'

'আমি আর আমার এই কাজের মেয়ে।'

মহিলাটি তার ব্যাগ থেকে তাদের নাক-মুখ ঢাকা কাপড়ের মতো দুটো কাপড় বের করে বললেন, 'আপনাদের এখন থেকে এরকম কাপড় পড়ে থাকতে হবে। তাহলে আপনারা সোয়াইন ফ্লু থেকে রক্ষা পাবেন।' বলেই মহিলাটি কাপড় দুটো ভাবী এবং কাজের মেয়েটার মুখে পরিয়ে দিলেন।

বিকেল বেলা বাসার ভাই অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখেন, তার স্ত্রী এবং কাজের মেয়েটা নাক-মুখ এক ধরনের কাপড় ঢাকা অবস্থায় মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু বাসার অনেক জিনিস উধাও, এমন কি আলমারির ভেতরে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যা ছিল তাও উধাও।

প্রিয় পাঠক, এ ঘটনাটাও বুঝে নিন। সুতরাং সাবধান।

বাসার সাহেব সব ফল খেতেই পছন্দ করেন, তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন কাঁঠাল। কাঁঠালের দিনে তিনি প্রতিদিন না হোক সপ্তাহে অন্তত তিনদিন কাঁঠাল নিয়ে আসেন বাসায়। তাছাড়া তার গ্রামের বাড়ি থেকেও কাঁঠাল চলে আসে মাঝে মাঝে। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর পছন্দের ব্যাপারে জেনে গেছেন, তারা ওই সময় বাসায় বেড়াতে এলে সঙ্গে কাঁঠালই নিয়ে আসেন।

সব কাঁঠালই তো আর একরকম সুস্বাদু না, কোনো কোনো কাঁঠাল মারাত্মকরকম সুস্বাদু হয়ে থাকে। বাসার সাহেব এরকম সুস্বাদু একটি কাঁঠাল পেলেন একদিন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী কাঁঠাল ভেঙে কয়েকটা কোয়া প্লেটে করে তাঁর সামনে দিলেন। তিনি একটা কোয়া মুখে দিয়েই আনন্দে নাচাতে লাগলেন চোখ দুটো। তারপর স্ত্রীর দেওয়া কোয়াগুলো শেষ করে স্ত্রীর আর অপেক্ষা করলেন না, নিজেই কাঁঠাল থেকে কোয়া বের করতে লাগলেন, অনেকগুলো কোয়া বেরও করে ফেললেন একসময়। কোয়াগুলো খাবার টেবিলে রেখে তিনি খেতে লাগলেন আনন্দচিত্তে। বেশ কয়েকটা কোয়া খাওয়ার পর তিনি টের পেলেন—একটা বিচি ঠেকেছে তাঁর গলায়। কাঁঠালের বিচি সাধারণত পিচ্ছিল হয়, এই বিচিটাও পিচ্ছিল ছিল, কিন্তু কী করে যেন বিচিটা আটকে যায় তাঁর গলায়। তিনি যতই কসরৎ করেন বিচি আর ঢুকাতে পারেন না গলার ভেতর, বেরও করতে পারেন না গলার বাইরে। এদিকে চোখ ফেটে আসতে চাচ্ছে তাঁর, গলা দিয়ে লালা বের হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছুই হচ্ছে না। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে কী যেন করছেন, ডেকে কোনো সাহায্যও চাইতে পারছেন না তার কাছে। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে ঘামতে লাগলেন তিনি অনবরত। মহাবিপদ! হঠাৎ খুক করে একটা কাশি দিতেই বিচিটা বের হয়ে আসে তাঁর গলা থেকে। তিনি প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে গলা থেকে বের হয়ে আসা বিচিটার দিকে তাকালেন। একটু পর সেটা হাতে নিয়ে একটু আগে নেওয়া নিশ্বাসগুলো ছাড়তে লাগলেন আস্তে আস্তে।

বাসার সাহেবের তৃতীয় মহাবিপদ

বাসার সাহেবের দ্বিতীয় বিপদ হয়েছিল অফিসের লিফটে। তাঁর অফিস কক্ষ বিল্ডিংয়ের ছয় তলায়। তিনি

লিফটে উঠে নিশ্চিন্ত চিত্তে উপরে যাচ্ছিলেন, দুই কি তিন তলা পর্যন্ত উঠেওছিলেন। হঠাৎ লিফটটা মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। তিনি ভেবেছিলেন, কেউ হয়তো বাইরে থেকে বোতাম টিপেছে, সেজন্য লিফটা থেমে গেছে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে সেটা যখন মিনিটে গিয়ে দাঁড়ায় সময়টা, ঠিক তখনই বাসার সাহেব টের পান—লিফটে আটকা পড়েছেন তিনি। ঘামতে শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে এবং এটাও অনুভব করেন—দম আটকে আসছে তাঁর, বুকের ভেতরটা লাফাতে শুরু করেছে, চোখ দুটোও ঘোলাটে হয়ে আসছে কেমন যেন। মহাবিপদ!

লিফটে লিফটম্যান ছিল না, ভেতরে তিনি একা ছিলেন এবং টানা সতের মিনিট আটকে থাকার পর যখন বাইরের লোকের সহায়তায় বের হয়ে আসেন লিফট থেকে, ততক্ষণে সারা গা ঘামে ভিজে গেছে তাঁর, ভিজে গেছে পরনের চকচকে প্যান্টটাও। লিফটে আটকে থাকা অবস্থায় তলপেটে বেশ চাপ অনুভব করেছিলেন তিনি, কিন্তু তেমন সর্বনাশ কিছু হয় নাই, তবু ঘামে প্যান্ট ভিজে যাওয়ায় অনেকে বিশেষ সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তিনি সেদিন।

বাসার সাহেবের তৃতীয় মহাবিপদ হয়েছে ঠিক একটু আগে। পৃথিবীতে অনেক রকমের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি, কিন্তু এরকম বিপদের সম্মুখীন হননি কখনো। পৃথিবীর আর কেউ হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। কোনোরকম বিপদ হলে মানুষ অন্যজনকে জানায়, এটা এরকমের একটা বিপদ অন্যজনকে জানানোর কোনো উপায় নেই তাঁর।

ছুটির দিন আজ। বারোটা বেজে গেছে। ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী প্রতিদিনের মতো এখনো ঘুমাচ্ছেন। এই সময় তাঁকে ডাকা নিষেধ। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলেই সারাদিন মেজাজ গরম হয়ে থাকে স্ত্রীর। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, তবুও তিনি ঘামতে লাগলেন।

মোবাইলটা হাতে নিলেন তিনি। একটু আগে যে মেসেজটা এসেছে সেটা বের করলেন। মেসেজটা পড়তে লাগলেন আবার।

আদমশুমারীর মতো সারা দেশব্যাপী দেশে কতজন পুরুষ আর কতজন নারী আছে তার একটা জরিপ চলছে। তো আপনি পুরুষ হলে এই নাম্বারে ১০০ টাকা, আর নারী হলে ৫০ টাকা পাঠান।

আর যদি এ দুটোর একটাও না হন মানে হিজরা হন তাহলে কোনো টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আমরা যা বোঝার বুঝে নেব।

বাসার সাহেবের মহাবিপদ এটাই—তিনি পুরুষ, এটা জানাতে ১০০ টাকা পাঠাতে হবে কেন? আবার না পাঠালে ওপাশের লোকজন তো তাঁকে অন্য কিছু ভেবে বসবে! তিন এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। মহাবিপদে মাথাটা বিগড়ে গেল তার, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললেন মোবাইলটা!

পুরাতন গল্প

বাচ্চাটি খুব আগ্রহ নিয়ে সামনের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে বলল, 'বাবা, এটাই কি চোর?'

বাবা নির্ভার স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

বাবার হাত থেকে নিজের আঙ্গুলটা ছাড়িয়ে নিল বাচ্চাটি। সামনের দিকে আরো একটু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, তার আগেই বাবা তার হাত টেনে ধরলেন। কিছুটা রেগে গিয়ে বাচ্চাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এটা কী বলছ, বাবা?'

'কেন, ভুল কী বললাম?'

'ওটা তো মানুষ, ওটাকে চোর বলছ কেন, বাবা!'

মুচকি হাসলেন বাবা। অবুঝ এই ছেলেটাকে তিনি কীভাবে বুঝাবেন—মানুষই চোর হয়। কেবল মানুষই প্রয়োজন ছাড়া অন্য মানুষের জিনিস দখল করে, লুট করে, ছিনতাই করে, কেড়ে নেয় ক্ষমতার গরম দেখিয়ে!

নতুন গল্প

'বাবা, তুমি কি জানো ওই লোকটার মাথায় কতগুলো চুল আছে?' সামনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে পাশে দাঁড়ানো বাবাকে বলল ছোট ছেলেটি।

'আমি কীভাবে বলব?' বাবা ছেলের মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, 'মাথার চুল তো গোনা যায় না, বাবা।'

মাথা উঁচু করে বাবার দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, 'ওই যে লোকটাকে বাঁশের খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, ওই লোকটার মাথায় যত চুল আছে, তোমার মাথাতেও ঠিক সেই পরিমাণ চুল আছে, বাবা।'

খুক করে কেশে বাবা বললেন, 'তা হতে পারে।'

'আচ্ছা বাবা, তোমারও তো দুটো হাত আছে, ওই লোকটারও দুটো হাত আছে। তাই না?' ছেলেটা আবার সামনের দিকে তাকাল।

ভণ্ড

বাবা ছোট্ট করে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'তোমার দুটো চোখ আছে, ওই লোকটারও দুটো চোখ আছে।'

বাবা আগের মতো ছোট করে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাবা দেখো, লোকটাকে মেরে চোখ দুটো কীভাবে ফুলিয়ে দিয়েছে। ভালো করে দেখতেই পাচ্ছে না সে।' ছেলেটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, বাবা।'

'খারাপ লাগারই কথা।'

'আর নাকটা কেমন থ্যাবড়া মেরে গেছে। নাকে মনে হয় অনেক ঘুষি মেরেছে বাবা, না?' বাবার গায়ে হাত রেখে ছেলেটা বলে।

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কপালেও কি মেরেছে, বাবা?'

'কপাল দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।' বাবা বিব্রত হয়ে উত্তর দিতে দিতে বলে, 'চলো, আর দেখতে হবে না, বাসায় চলো।'

'আর একটু, বাবা।' ছেলেটা এবার বাবার একটা আঙ্গুল ধরে বলে, 'ওনার কি আমার মতো ছেলে আছে?'

'তা তো জানি না।'

'সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো বাবা—লোকটা দেখতে হুবহু অন্যান্য মানুষের মতো। অন্যান্য মানুষের মতো তার নাক আছে, চোখ আছে, মুখ আছে, ঠোঁট আছে, চুল আছে, দাঁত আছে—সব আছে।'

'তা আছে।'

'অথচ তুমি তাকে বলছ—ভণ্ড। আশপাশের অনেকেই তাকে ভণ্ড বলে গালি দিচ্ছে, কটুক্তি করছে, অনেকে তাকে মেরেছেও।'

'হ্যাঁ, লোকটা তো ভণ্ডই। প্রতারণা করে সে রাজশাহীর চণ্ডিপুর এলাকার এক মহিলার কাছ থেকে পাঁচ লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছে, উনিশ ভরি সোনাও সে বাগিয়ে নিয়েছিল তার কাছ থেকে। তাছাড়া আরো অনেক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সে। যে লোক এত কিছু করে সে তো ভণ্ডই।'

'কিন্তু আশ্চর্য কি বাবা জানো—একজন ভণ্ড মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেহারার কোনো পার্থক্য নেই। যেমন পার্থক্য নেই কোনো ঋণখেলাপির সঙ্গে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা রাজনীতিবিদের সঙ্গে, কর ফাঁকি দেওয়া কোনো শিল্পপতির সঙ্গে, সরকারি হাসপাতালে সময় না দিয়ে প্রাইভেট অফিসে সময় দেওয়া ডাক্তারের সঙ্গে, খাবারে ভেজাল দেওয়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে। আরো অনেকের সঙ্গেই পার্থক্য নেই। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল বাবা—আমাদের চারপাশেই ভণ্ডদের ছড়াছড়ি, যেদিকে চোখ যায় শুধু ভণ্ড আর ভণ্ড। বাবা, এত ভণ্ডদের মাঝে আমরা বাস করি!

না, তাঁর জন্য কোনো শোক প্রস্তাব আনেনি কেউ। টেবিল থাপড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে কিংবা কাঁপা কাঁপা গলায় কেউ বলেনি– আপনার জন্য দুঃখিত আমরা, আপনার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত, হৃদয় ভেঙে গেছে আমাদের, আমরা কোনোদিন আপনাকে ভুলব না। কারণ–তিনি কোনো ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ নন!

তাঁর জন্য কোনো শোক বইও খোলা হবে না। সুন্দর করে বাঁধাই করা সেই বইয়ের ঝকঝকে পাতায় কেউ দামী কলম দিয়ে সইও করবে না, লিখবে না–এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মৃত্যুর আগে তুমি করে গেলে দান। কেউ কেউ লেখাপড়া না জেনেও কেবল দামী পোশাকের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে শিক্ষিতের ভাব করে ভুল বানানে লিখবে না–আমরা আপনার মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত, মর্মাহত। কারণ–তিনি কোনো উপচে পড়া টাকার মালিকও নন!

কালো চশমায় চোখ ঢেকে কেউ কান্নার ভানও করবেনা কিংবা মেকি কান্নায় বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছে কেউ বলবে না, আপনি চলে যাওয়াতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল দেশের, আপনার ক্ষতি আমরা কোনোভাবেই পুশিয়ে নিতে পারব না। কারণ–দেশের কোনো নামী মানুষ তিনি নন।

কোনো প্রতিবাদও হবে না তাঁর মৃত্যুতে। কোনো নামী-দামী কলামিস্ট দু'কলম লিখবেনও না তাকে নিয়ে। এমন কি তাঁর প্রতিবেশীরাও তাঁকে নিয়ে তেমন কাতরতায় ভুগবে না। কারণ–তিনি কোনো দানশীল কিংবা সমাজসেবকও নন।

তাঁর মৃত্যুর খবর জানাতে কোনো মাইকিং হবে না। তেমন কোনো মানুষও হবে না তাঁর জানাজায়। লাইনের পর লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ মোনাজাতেও অংশগ্রহণ করবে না কিংবা শ্বেতপাথরে বাঁধাই হবে না তাঁর কবরখানাও। কারণ–তিনি খুব সাধারণ একজন মানুষ, খুবই সাধারণ।

শোক

কে এই তিনি

সকাল হলেই ঘুম থেকে উঠে ইদানীং তিনি তাঁর বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে যান। ঘরে আয়না নেই, যাও আছে ভাঙা, ভাঙা আয়নায় মুখ দেখেননা তিনি। মুরব্বীরা বলতেন, ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা ভালো না। যদিও সেই ভাঙাটাই তাঁর মেয়েদের দখলে থাকে অধিকাংশ সময়।

বেশ কয়েকদিন ধরে একটা স্বপ্ন দেখছেন তিনি, একই ধরনের স্বপ্ন—তাঁর চোখ দুটোর জায়গা ঠিকই আছে, কিন্তু সেই জায়গাটায় কোনো চোখ নেই, সাদা বলটা নেই, তার ওপরে ভেসে থাকা কালো মণিটাও নেই।

স্বপ্ন দেখার পরপরই ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। তিনি পুকুর পাড়ে গিয়ে পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে মুখটা দেখেন, তারপর দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, অন্ধ হয়ে যাননি এখনো!

স্বপ্নের কথা তিনি কাছের কয়েকজনকে বলেছেন। শুনে তাঁরা মুখটা কালো করে ফেলেছেন, কেউ কেউ বলেও ফেলেছেন—মৃত্যুর লক্ষণ এটা।

মনে মনে ভয় পান তিনি, সারাক্ষণ এই নিয়ে টেনশনে থাকেন—কখন কী হয়ে যায়! এভাবে ভয়ে ভয়ে পথ চলতে গিয়েই একদিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেন তিনি, খুব দ্রুত চলা একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খান। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

প্রিয় পাঠক, এটা কোনো সত্য ঘটনা নয়, গল্প। সর্বপ্রথমে যে মৃত ব্যক্তির কথা লেখা হয়েছে, এই তিনি সেই 'তিনি'ও নন। আমাদের ওই তিনি হচ্ছেন একজন রাজমিস্ত্রি, নাম তাজুল ইসলাম।

রাজমিস্ত্রি তাজুল ইসলাম কোনো স্বপ্ন দেখতেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে বড় বড় বাড়ির মালিক হওয়ার যারা স্বপ্ন দেখতেন তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণের সহায়ক ছিলেন তিনি। একদিন, একদিন ঘুম থেকে উঠে, টিনের ছাপড়া ঘরে তিন শিশু কন্যা ও স্ত্রীকে রেখে কাজের সন্ধানে কিংবা কোনো জায়গায় কাজের জন্য যাওয়ার সময় পুলিশ-পোশাককর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন, পরে মারা যান তিনি।

দুঃখিত, তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অধিকাংশ মানুষ শোক প্রকাশ করেননি। কেবল কয়েকটি কাক বিকট স্বরে কা কা করেছিল, কয়েকটা নেড়ি কুকুর বিলাপ করেছিল চিঁ চিঁ করে। মানুষের কষ্ট এখন মানুষকে স্পর্শ করে না, কিন্তু প্রাণিদের করে।

আসুন, এই লজ্জায় আমরা সবাই আত্মহত্যা করি!

বাসার সাহেব বাসায় ঢুকেই দেখেন একটা কেক রাখা আছে ডায়নিং টেবিলে। তিনি আস্তে আস্তে কেকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। মাঝারি সাইজের কেক, কেকের ওপর ইংরেজিতে লেখা—কনগ্রাচুলেশনস! চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন তিনি। কীসের অভিনন্দন, কাকে অভিনন্দন! ভালো করে তিনি আবার কেকের দিকে তাকালেন, না, কনগ্রাচুলেশনসই লেখা। বানানটা ঠিকই লিখেছে, শুদ্ধ করেই লিখেছে।

কেকটার পাশে বড়-সড় একটা মোমবাতি আছে, প্যাঁচানো মোমবাতি, কিছুটা লাল ধরনের। এসব মোমবাতি সাধারণত জন্মদিনে ব্যবহার করা হয়। আজ কি কারো জন্মদিন? জন্মদিন হলে তো ওখানে নামসহ হ্যাপি বার্থডে লেখা থাকত, কিন্তু—। কোনোকিছুই মাথায় আসছে না তাঁর।

শরীরে বেশ বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরল আছে তাঁর। ফলে প্রচণ্ড ঘামেন তিনি, সে জন্য প্রচুর পাউডারও ব্যবহার করতে হয় তাকে। শীত আসছে, আবহাওয়া তেমন গরম না, অভ্যাসবশত আজও তিনি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর পাউডার ব্যবহার করেছেন। তবে সব জায়গার পাউডার দেখা না গেলেও গলার নিচে ভেসে থাকা পাউডারগুলো আজ কেমন যেন রুটি বানানোর আটার মতো জমাট বেধে আছে। একটু আগে শরীরটা যা ঠাণ্ডা ছিল, এখন গরম হতে শুরু করেছে আবার। গলতে শুরু করেছে গলার নিচের পাউডারগুলোও।

রান্নাঘর থেকে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এদিকে আসছিলেন বেগম বাসার। স্বামীকে দেখেই ছোট-খাটো একটা আনন্দ চিৎকার দিয়ে তিনি বললেন, 'কখন এসেছ তুমি? আমি তো এই ঘরেই ছিলাম, কিছুই তো টের পেলাম না।'

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না বাসার সাহেব। ডায়নিং টেবিলের ওপর রাখা কেকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বেগম বাসার প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে বললেন, ওটা তোমার জন্য আনা হয়েছে। অবশ্য তোমার ছেলেমেয়েরা মিলে কিনে এনেছে। আমার কাছে এসে বলল, মা টাকা দাও। আমি বললাম, কীসের টাকা? ওরা বলল, কেক আনব। আমার কাছে তো কোনো টাকা থাকে না, সংসারের এটা ওটা কিনতেই শেষ হয়ে যায়। পঞ্চাশটা টাকা ছিল, ভাবলাম কেক খেতে ইচ্ছে করছে ওদের, ভালো-মন্দ তো কিছু খাওয়াতে পারি না, দিয়ে

বেতন বাড়ার পর

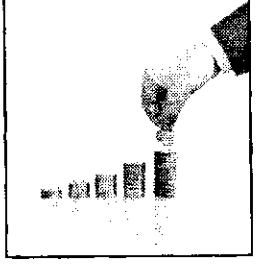

দিলাম ওদের। কেকটা আনার পর জানলাম, ওদের কাছে আরো পঞ্চাশ ষাটটা টাকা ছিল, সব কিছু দিয়ে তোমার জন্য কেকটা এনেছে ওরা।'

বাসার সাহেব গম্ভীরস্বরে ছোট্ট করে বললেন, 'কেন?'

'সেটা তোমার ছেলে-মেয়েকে জিজ্ঞেস করো।'

'তুমি জানো না?'

'জানি, কিন্তু বলব না।' মিটিমিটি হাসতে থাকেন বেগম বাসার।

'তোমার ছেলে-মেয়েরা কোথায়?'

'ফুলের মালা কিনতে গেছে।'

'ফুলের মালা কেন?'

'সেটাও ওরা বলতে পারবে, আমি জানি না।'

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন বাসার সাহেব। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন তাঁর দু মেয়ে এবং ছেলেটা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছে, বড় একটা ফুলের মালা তাদের হাতে। বাবাকে দেখে তারা খুব আনন্দিত স্বরে বলল, 'কনগ্রাচুলেশনস, বাবা।'

ভ্রূ কুঁচকে বাসার সাহেব বললেন 'কনগ্রাচুলেশনস! হঠাৎ কনগ্রাচুলেশনস?"

'কারণটা তো তুমি জানো, বাবা।' আহ্লাদে গদ গদ হয়ে বলল বড় মেয়েটা।

বাসার সাহেব বরাবরের মতো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কই, কোনো কারণ তো দেখছি না আমি।'

'তোমার বেতন বাড়ে নি?' মুখটা হাসি হাসি করে বেশ স্মার্ট ভঙ্গিতে কথাটা বলে ছোট মেয়েটা বাসার সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়, 'আমাদের আর অভাব থাকবে না, বাবা। আমরা সপ্তাহে অন্তত একদিন মাংস খেতে পারব, মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যেতে পারব, আমি আর আপু অঙ্কের কোচিংটাও করতে পারব, তাই না বাবা?'

বুকটা কেঁপে ওঠে বাসার সাহেবের। চোখ দুটোও শিরশির করে ওঠে, গলার কাছেও কী যেন জমাট বেধে আসে। তিনি তবুও স্বাভাবিকভাবে বলেন, 'আমার তো বেতন বাড়েনি, মা।'

'পেপারে যে লিখেছে!'

বাসার সাহেব চেহারা দুঃখী দুঃখী করে বললেন, 'আমাদের না, মা। যারা সরকারি চাকরি করেন তাঁদের বেড়েছে।' বাসার সাহেব আস্তে আস্তে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান। তারপর অফিস থেকে ফেরার সময় বাজার করে আনা বাজারের ব্যাগটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে করুণ গলায় বলেন, 'কালকে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল, আজকে প্রায় দেড় গুণ হয়ে গেছে সেই জিনিসগুলোর দাম। আগে তাও তিন বেলা কিছু না কিছু খেয়ে দিন কাটাতে পারতাম, এখন বোধহয় মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হবে।' সামনে দাঁড়ানো তিন সন্তান আর স্ত্রীর দিকে তাকালেন বাসার সাহেব। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে তাঁর–সন্তানদের জন্ম দিয়ে অভুক্ত রাখার লজ্জায়, পরাজিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার ঘৃণায়। একটু পর বাসার সাহেব খেয়াল করেন, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে তিনটিও কাঁদছে। সূর্যটা ডুবে গেছে অনেক আগেই। বাইরে কোনো আলো নেই। জীবনের পরতে পরতে ঢেকে দেওয়া অন্ধকারের মতো সবকিছু এখন অন্ধকার, হতাশার মতো অন্ধকার!

খুব সকালেই বাসা থেকে বের হলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা, খুব সকালে বের হলেন জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও। উদ্দেশ্য তাঁদের একটাই।

সাধারণত এত সকালে ঘুম থেকে ওঠেন না তাঁরা। মাঝে মাঝে ওঠেন, কিন্তু বাইরে বের হন না কখনো। আজ হয়েছেন এবং বের হয়েই তাঁরা অস্ফুট স্বরে বলে ফেললেন, 'কী সুন্দর সকাল, কী সুন্দর পৃথিবী!'

সকালের একটা সুন্দর সুবাস আছে। টের পেলেন তা দুজনই। ঠাণ্ডা সুবাস, কিছুটা ভেজা ভেজা। গাছের পাতাগুলোও কেমন চকচকে মনে হয়।

কোথা থেকে যেন একটা পাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ। চমকে ওঠেন দুজনই। কতদিন পর এরকম পাখির ডাক শুনলেন! ছোটকালে জানালার পাশে এসে দোয়েল ডাকত, চড়ুই এসে লাফালাফি করত, কখনো ফিঙে এসে লেজ দুলিয়ে যেত। সেই দিনগুলো যে কোথায় গেল, কোথায় পালাল!

দুজন এক সঙ্গেই ভাবতে থাকেন—সেই দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন? মুচকি হাসেন তাঁরা, ভাবনাটা শেষ করেন না। মাথার বেশ ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুনো পাখি উড়ে যাচ্ছে, কড়কড় করে শব্দ করছে তারা, যেন তারা হাসছে, আনন্দ করছে।

এমন যদি হতো

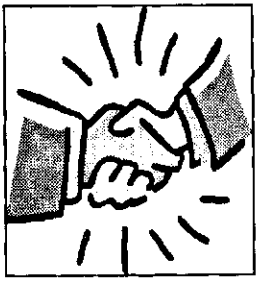

দু জন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাস্তা পরিষ্কার করছে দুজন পুরুষ আর দুজন মহিলা। সিটি কর্পোরেশনের ড্রেস পরে তারা মাথা নিচু করে ঝাঁড়ু দিচ্ছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, গভীর কী একটা চিন্তা করছেন তারা। আচ্ছা, এ মানুষগুলোর সঙ্গে কি কেউ কখনো কুশল বিনিময় করে, আপন হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছো তোমরা?'

পেপার পেপার করে ছুটে চলছে হকার। ধীরে ধীরে রাস্তায় মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে ব্যস্ততা। দুজন পা

চালালেন দ্রুত।

বেশ কিছু দূর আসার পর রাস্তার মাঝখানেই দেখা হয়ে যায় দুজনের। দুজন দুজনকে দেখে কিছুটা দ্রুতগতিতে এসে জড়িয়ে ধরেন পরস্পরকে। তারপর জননেত্রী শেখ হাসিনা হাসতে হাসতে বললেন, 'কেমন আছেন, আপনি?"

জননেত্রী খালেদা জিয়াও হাসতে হাসতে বললেন, 'ভালো, আপনি?'

'আমিও ভালো আছি।' শেখ হাসিনা একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু এত সকালে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'প্রশ্নটা তো আমারও—এত সকালে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'বলব?' শেখ হাসিনা আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন।

'বলুন না।' খালেদা জিয়াও হাসতে থাকেন।

'আমি তো আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম।'

'সত্যি! আমিও তো আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম।'

'কেন?'

'আপনি কেন যাচ্ছিলেন?' খালেদা জিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

শেখ হাসিনা খুব আপনজনের মতো খালেদা জিয়ার দুটো হাত চেপে ধরে বলেন, 'দেশে একটা নির্বাচন হয়ে গেল, নতুন একটা বছরও এসে গেল। চলুন না, দুজন মিলে দেশটাকে নতুনভাবে সাজাই, নতুনভাবে সব কিছু গড়ে তুলি। নিজেরা সুখী হই, দেশের মানুষকেও সুখে রাখি।'

'হায় হায়, এটা তো আমার কথা। এই কথাটা বলার জন্যই তো আমি আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম।'

বেশ কুয়াশা ছিল একটু আগে, আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে সেটা। কী একটা পাখি শিস কেটে উড়ে যাচ্ছে। তাই দেখে খালেদা জিয়া বলে উঠলেন, 'জীবনটা অনেক সুন্দর, না?'

'মধুরও।' শেখ হাসিনা বললেন।

খুব স্পষ্টভাবে তোমাকে বলতে পারি, তুমি আমি দুজনই ভাগ্যবান। আমাদের সনাতন জীবনযাত্রায় আমরা হয়তো সেই প্রাচীনই আছি। আমরা এখনো থালা ভরে ভাত খাই, পাঁচ আঙ্গুলে মেখে মেখে খাই, খাওয়ার পর আনন্দে সশব্দ ঢেঁকুরও তুলি। কখনো কখনো দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে খাবারের রেশটা মেখে নেই চেহারায়। আমাদের জীবন কেটে যায় এভাবেই।

কতরকম যন্ত্র এসেছে এই পৃথিবীতে, ঠাণ্ডা হওয়ার যন্ত্র। এসির বাতাসে আমরা আমাদের শরীর জুড়াই, মন জুড়াই, ঠাণ্ডা করি নিজেকে। কিন্তু এখনো দখিনা বাতাসের জন্য আমরা দক্ষিণ পাশের জানালা খুঁজি, ঝিরিঝিরি একটু বাতাসের জন্য আমরা আকুল হয়ে যাই, নিজেকে যতটুকু সম্ভব উন্মুক্ত করে বাতাসে মাখিয়ে নেই নিজের শরীরটা।

মাথার ওপর কনক্রিটের ছাদ আছে আমাদের, শক্ত ছাদ। নিরাপত্তার নিচ্ছিদ্র মহড়ায় আমরা দিন কাটিয়ে দেই, স্বপ্নের প্রলেপ দেওয়া অন্ধকারে রাত কাটিয়ে দেই। তবু কোনো গাছের ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ি আমরা, সেই ছায়াতে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে জুড়িয়ে নেই নিজের ভেতরটা, একেবারে শান্ত করে নিই সমস্ত অস্থিরতা।

শাওয়ারে গোসল করতে খুব মজা লাগে আমাদের। শীতের দিনে গরম পানি, গরমের দিনে ঠাণ্ডা পানি—যখন যেমন চাই তেমন পাই। সেই আমরা কোনো নদী দেখলে থমকে দাঁড়াই, অপার নয়নে নদীর জল দেখি। বুকের ভেতর আকুপাকু করে সেই স্বচ্ছ পানিতে লাফিয়ে পড়তে, ডানা মেলে গোসল করতে, সেসব না হোক অন্তত একটু ছুঁয়ে দেখতে অথবা নিজের ছবি—স্বচ্ছ জলে স্বচ্ছ মানুষ।

'চার দেয়ালের মাঝে নানান দৃশ্যকে, সাজিয়ে নিয়ে

দেখি বাহির বিশ্বকে।' মান্না দে গেয়েছিলেন। আমরা আমাদের ঘরের ভেতরটা সত্যি নানানরকম জিনিস দিয়ে সাজাই। কত্তোরকম জিনিস যে আমাদের ঘরে, ঘরের অন্তরে। কিন্তু শিশির ভেজা ঘাস দেখলে আমরা স্থির করে ফেলি চোখ। টলটলে জলে ঠোঁট ছোঁয়াই, আপন আবেশে হাতে মেখে মুখে মিশাই। ভেজা পরশে নিজেকে হারাই।

খাবারের জন্য কত কি করি। মানুষ সর্বভূক প্রাণী, পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসকেই খাদ্যে রূপান্তরিত করে সে। আমরা চায়নিজ খাবার খাই, ইটালিয়ান খাবার খাই, পিজা, পেস্তা, চিকেন ফ্রাই, স্যুপ-উনথুন—সব খাই। এত কিছু খাওয়ার মাঝেও আমরা কোনো কোনো দিন আলু ভর্তায় ফিরে যাই, স্রেফ সবজি মেখে চপর চপর করে ভাত খাই, ডাল চচ্চড়ি আর সাদা ভাতে ভরিয়ে ফেলি অভুক্ত পেট। আজন্ম তৃপ্তি নিয়ে বুজে ফেলি দু চোখ।

দামী কাপড়ের আবরণে নিজেকে ঢেকে আমরা ভদ্দরলোক হই। স্যুট-টাই, জামদানী-সালোয়ার, আরো কত কী! কিন্তু দিন শেষে সেই আদি সুতির পিরান, সেই এগার হাত তাঁতের আচ্ছাদন। ঘুম এসে যায় আরামে!

দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, বছর কেটে যায়। কত রকম আফসোস আমাদের—এটা হলো না, ওটা হলো না। ইশ, আরো একটু ভালো কাটাতে পারতাম, আরো একটু টাকা, আরো একটা বাড়ি, আরো একটা গাড়ি! কিন্তু অনেক কিছু না পেয়েও এ বছরে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে কয়েক হাজার আদম—আমার তোমার মতোই হাত-পাওয়ালা মানুষ। কিন্তু আমি বেঁচে আছি, তুমি বেঁচে আছো। মুক্ত নয়নে এখনো আমরা ঘাস দেখছি, বর্ণিল আকাশ দেখছি, বুক ভরে নিতে পারছি ইচ্ছে মতো বাতাস। তারপরও তুমি বলবে না—আমরা ভাগ্যবান! কোটি কসমের দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা ভাগ্যবান, আমরা এখনো বেঁচে আছি প্রিয়তমা!